৫০টি ইলেকট্রনিক মডেল

ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট

সুজিত কুমার পাল

৫০ টি ইলেকট্রনিক মডেল

ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট

সম্পাদনা : সুজিত কুমার পাল

BANSDOC Library
Accession No. 21031

শব্দশৈলী

মডেল–০১ ভানুমতীর খেল

পর্দা উঠল। যাদুকর ভানুমতী অর্থাৎ ছোট মামা, চ্যাপলিনের কায়দায় দাঁড়িয়ে শুরু করলেন যাদুর খেলা। মঞ্চের একপাশে সহকারী হিসেবে হাজির রয়েছে শৈলী।

–এবার আপনারা দেখবেন আজকের প্রধান আকর্ষণ, আমার মায়াবী যাদু 'ম্যাজিক ল্যাম্প'!

দর্শক-আসনের সামনের সারিতে বসে আছেন-বদমেজাজি রাঙাকাকা, সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই আর আমাদের সব থেকে অপ্রিয় খিটকেলে মেজমামা।

আমি তো ভালোমতোই জানি, যদি একবার ম্যাজিক ল্যাম্পের ম্যাজিক ধরা পড়ে, তা হলে ওদের মাথায় 'গাঁট্টা' নামক দুষ্প্রাপ্য সার সহযোগে আলুর যে চাষ হবে-তা কেউ রুখতে পারবে না।

ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ম্যাজিশিয়ান ভানুমতী ওরফে ছোটমামা'র গলা শোনা গেল, -হঠাৎ যদি লোডশেডিং হয় আপনারা কী করেন? নিশ্চয়ই বাতি জ্বালান, কিন্তু আমি তা করি না। আমি আমার মায়াবী যাদুকে কাজে–

ছোটমামা'র কথা শেষ হওয়ার আগেই শোনা যায় রাঙাকাকার হুঙ্কার,–ঢের হয়েছে বক্তৃতা, পাখা বন্ধ করে গরমে আর ক্যারামতি দেখাতে হবে না। চটপট যাদুর খেলা শেষ কর!

যাদুকর ভানুমতী মিটমিটি হাসলেও তার মনের মধ্যে যে বেশ চাপা ভয় চেপে বসেছে, সেটা আঁচ করতে পারি।

যাদুকর বাক্সে ফুঁ দেন, আলো জ্বলে ওঠে। আবার সহকারী ফুঁ দেন, আলো নিভে যায়।

এরপর যা ঘটল, তার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। দুম করে অপ্রিয় মেজমামা ভানুমতী অর্থাৎ ছোটমামাকে দশ টাকা দিয়ে বসলেন, সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই ছোটমামাকে দিলেন একদিনের ছুটি আর রাঙাকাকার প্রতিশ্রুতি রইল আরো ভালো কিছু দেওয়ার।

পুরস্কার সবই যখন ছোট মামা পাচ্ছে, তখন শৈলী গেল খেপে। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে শুরু করল রাজনৈতিক নেতার ঢং-এ ভাষণ,–বন্ধুগণ, আজ আপনারা যে ম্যাজিকটি দেখলেন-সেটি আসলেই মায়াবী যাদু নয়, বিজ্ঞানের এক ভ্যাবাচ্যাকা।

শৈলীর এরপরের কথাগুলো এবার নিজের ভাষায় বলছি, তোমরা কান খাড়া করে শুনে নাও।

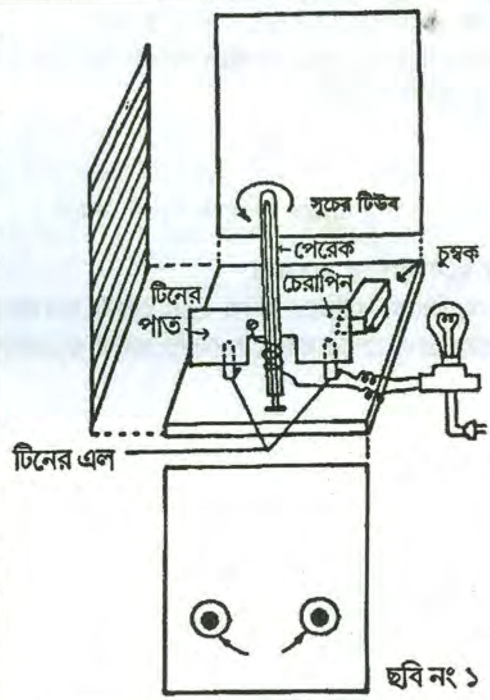

ছবি নং ১

ছবি নং ২

একটা তক্তার ওপর, একটা বড় মাপের পেরেক পিছন থেকে মেরে (ছবি নং-১) খাড়া করো। এবার ছুঁচ রাখার কাচের টিউবের খোলা মুখটা নিচের দিকে করে পেরেকের মধ্যে পরিয়ে দাও। একটা টিনের পাতকে কাচের টিউবের গায়ে বেঁকিয়ে, (ছবি নং-২) একপাশে চেরাপিন দিয়ে পাখার মতো লাগাও। এই টিনের পাতটি ফুঁ দিলেই ঘুরবে। টিনের পাতটির একপাশে একটি চুম্বক বসাও (ছবি নং–১)। পাতের দুপাশে তক্তার ওপরে দুটো টিনের 'এল'এমনভাবে সেঁটে দাও, যেন টিনের পাতটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বেশি ঘুরতে না পারে।

মেইন 230 ভোল্ট (V) থেকে আসা তারের একটি প্রান্ত টিনের পাতের গায়ে, আর অন্য একটি তারকে চুম্বকের যে পাশে 'এল' আছে, তার সঙ্গে আটকে দাও। 'এল'-এ লাগানো তারের অপর প্রান্তটি কিন্তু থাকবে হোল্ডারের এক প্রান্তে–হোল্ডারের অপর প্রান্তটি এরপর সোজা চলে যাবে মেইনে।

কাঠের বাক্সের মধ্যে তক্তায় ফিট করা পুরো জিনিসটা বসিয়ে দিয়ে, ওপর থেকে আরেকটা তক্তা মেরে বাক্সটা বন্ধ করে দাও।

তক্তাটা এমন করে বসাও, যেন টিনের পাতের আড়াআড়ি দিকটা গর্তের সঙ্গে আনুভূমিক থাকে। ডানদিকের গর্তে ফুঁ দিলে টিনের পাতটি ঘুরে চুম্বকের দিকে যাবে। ধাক্কা খেয়ে টিনের পাতটা যাতে ফিরে না যায়, সেজন্য রাখা আছে চুম্বকটি-যা চেরাপিনের মাথাটাকে টেনে রাখবে।

আবার বাঁদিকের গর্তে ফুঁ দিলে পাতটা ঘুরে যাবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে তার লাগানো 'এল'-এর সঙ্গে–অমনি অন্ধকার!

একটা কথা বিশেষভাবে মনে রেখো, ভ্যাবাচ্যাকাটা 230 ভোল্ট নিয়ে, তাই সবসময়ই খুব সতর্ক হয়ে কাজ করবে।

শৈলী'র বক্তৃতায় খুশি হয়ে মেজমামা এবার শৈলীকে দিলেন কড়কড়ে পাঁচ টাকা, পণ্ডিতমশাই দিলেন হাফ-ছুটি আর রাঙাকাকা পিঠ চাপড়ে শৈলীকে দিলেন বাহবা।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

এখানে ম্যাজিকের খাতিরে যদিও ২৩০ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তোমরা ব্যাটারিও ব্যবহার করতে পার। এতে ১০০ ওয়াটের ল্যাম্পের বদলে ৩ ভোল্ট অথবা ৬ ভোল্ট-এর মিনিয়েচার বা টর্চের ল্যাম্প ব্যবহার করো।

মডেল-০২

ইনস্ট্যান্ট কালার টি.ভি.

এপাড়ার ভুতো একাদশ বনাম ওপাড়ার কেলো একাদশের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ। স্থান ঃ বাবলিদের বাগানবাড়ির উঠোন। সময় ঃ সকাল দশটা। দুদিকেই বসেছে উইকেট।

সেজকাকার ল্যাবরেটরির অ্যাপ্রন গায়ে দিয়ে মালির চুন-খয়া ঘরের দালানে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে তাপস ভাইয়া।

অনেক চোখের জল খরচা করে, বাবার পয়সায় আনা মাইক হাতে আমি ভাষ্যকার-সানিক দাদা। মাউথপিস আমার হাতে। খেলা শুরুর আগে টেস্ট করে নিচ্ছি মাইক্রোফোন...ওয়ান, টু, থ্রি...।

এই পর্যন্ত সবকিছু টিপটপ, ঠিকঠাক।

ঠিক হয়েছে, যে দল ব্যাট করবে, তারা বসবে মালির ঘরে, থুড়ি প্যাভেলিয়নে। কিন্তু গোল বাধল ওই বসা নিয়েই। প্যাভেলিয়নের জানালা মাত্র একটা, তা-ও আবার অ্যাত্তটুকু! বড়জোর দুটো মাথা ঠোকাঠুকি করে খেলা দেখতে পারে। কিন্তু বাকিদের কী হবে? ওরা কি সব অন্ধকার ঘরে সারাক্ষণ মশা মেরে সময় কাটাবে?

ভাবনায় সবার মাথা বনবন করে ঘুরছে। বলা তো যায় না, হয়তো এই ছোট ব্যাপারের জন্যই খেলাটা শেষতক পণ্ড হয়ে যাবে।

তাপস ভাই বলল,-অ্যাতো ঝামেলা কিসের? তা হলে তোরা বাইরেই বোস।

তাই বা কী করে হয়, প্লেয়ারদের তো একটা গ্ল্যামার আছে!-দুই একাদশের অলক-বুলবুল- টেন্ডুলকারদের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ঃ কী হয়, কী হয়?

ঘড়ির কাঁটায় এগারোটা বেজে গেছে, খেলা শুরুর নামগন্ধ নেই।

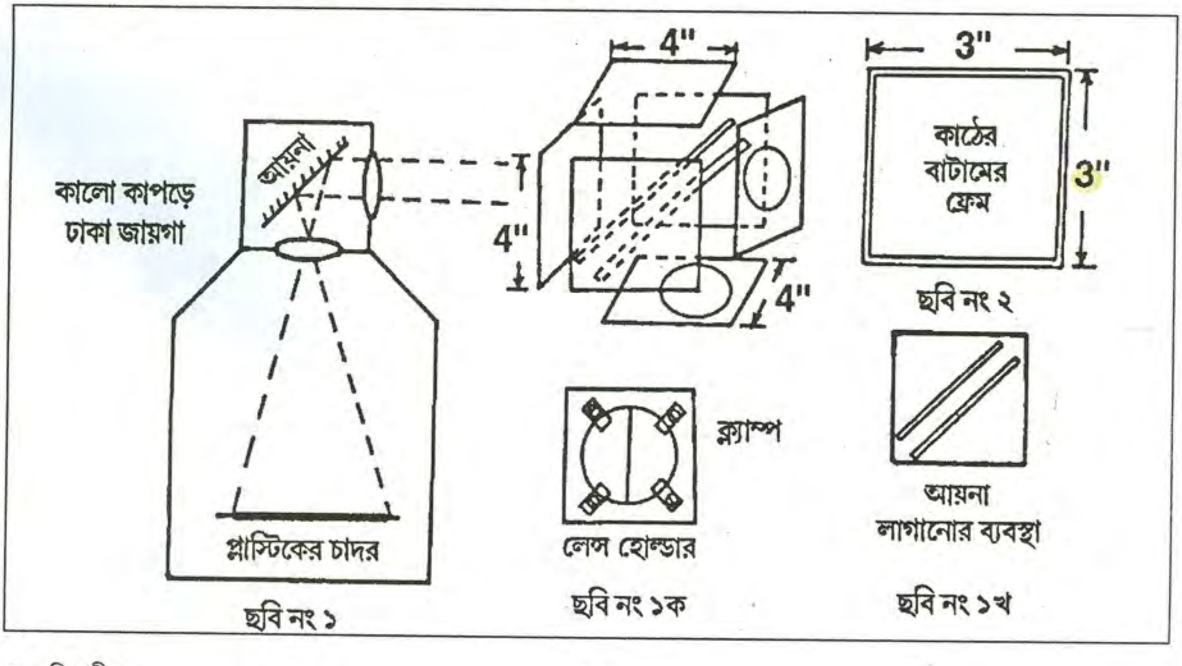

ছবি নং ১   ছবি নং ১ক   ছবি নং ১খ   ছবি নং ২

সেই মুহূর্তে অতি উৎসাহী সেজকাকার প্রবেশ। দুহাতে দুটো বাক্স। বুঝে নিই, প্লেয়ার পিছু আধা ডিম আর কোয়ার্টার পাউরুটি এসে গেছে। কিন্তু বাঁহাতের বাক্সটা ...?

–নো চিন্তা, ডু ফুর্তি।

সেজকাকার কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম।

...খেলা শুরু। প্যাভিলিয়নের প্রান্ত থেকে ভুতো একাদশের ইমরান খাঁন বল করার জন্য প্রস্তুত। ...প্রথম বল, একটু খাটো লেংথের ওপর ছিল! অধিনায়ক কেলো কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আস্তে ফরোয়ার্ড খেললেন। ...এখন ঘড়িতে ঠিক একটা বাজে। এবার মধ্যাহ্নভোজের বিরতি, আমরা ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে ...।

মাউথপিসটা পোঁটলার হাতে দিয়েই তড়িঘড়ি ছুটলাম প্যাভেলিয়নে সেজকাকার ক্যারামতি দেখতে।

ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠি,–আরে, এ যে কালার টিভি!

দেখি, সাজঘরের জানলাটা কালো কাপড়ে পুরো ঢাকা। তার মাঝখানে মাপসই কেটে, ইঞ্চি চারেক চৌকোনা কার্ডবোর্ডের বাক্স উঠোনের দিকে মুখ করে বসানো (ছবি নং-১)। এর সামনের দিকে আর তলার 3" ব্যাসের একটা করে উত্তল লেন্স চারটে ক্ল্যাম্প হোল্ডার দিকে বাক্সের মধ্যে সাঁটা রয়েছে (ছবি নং-১-ক)।

দুপাশের দু-দেওয়ালে দু-টুকরো বাটাম দিয়ে তৈরি খাপে (ছবি নং-১-খ) একটা আয়না 45° কোণ করে লাগানো। আর, ঠিক বাক্সটার তলায় তিন ফুট আন্দাজ নিচে রাখা আছে, কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা প্লাস্টিকের একটি চাদর। এটি অনেকটা সিনেমার পর্দার মতো-যার ওপর এসে পড়ছে মাঠের ছবি, যেন ইনস্ট্যান্ট কালার টি.ভি.। (মালির ঘরটা এমনিতেই অন্ধকার, তাই ছবি নং-১-এর মতো করে আলাদা কাপড়ে আর ঢাকার প্রয়োজন হয়নি।)

এইরে, ভুতো একাদশ যে ফিল্ডিং করতে মাঠে নেমে পড়েছে। ...যদিও পেটে চড়চড়ে খিদে, তবুও... বিদায়!...

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

ছবিতে প্রতিটি যন্ত্রাংশ আলাদা করে আঁকা আছে। তবে বাক্সটি প্লাইবোর্ডের করলে ভালো হয়। লেন্স লাগানোর দেওয়ালগুলো থেকে ২ ভাগের ১.২ ব্যাসের মতো গোল করে কেটে নিতে হবে। এর ফাঁক দিয়েই বাইরের আলো এসে পড়বে আয়নায়। আয়নার সামনের দিক থাকবে লেন্সদুটোর দিকে আর, চৌকো বাক্সটার ঠিক নিচে-আনুভূমিকভাবে মাঝবরাবর থাকবে প্লাস্টিকের সাদা চাদরটা।

মডেল–০৩

ডানাভাঙা পাখি

ফেলুমামার পাখি পোষার ব্যারামটা বহুদিনের। মাঝে-মধ্যেই দেখা যেত নতুন-নতুন খাঁচা হাতে ফেলুমামা চলেছে হন্তদন্ত হয়ে। আর খাঁচায় থাকত হরেক রঙের নানান পাখি।

কিন্তু কেন জানি না, ওই সব পাখিদের ফেলুমামা বেশি দিন খাঁচায় ধরে রাখতে পারতেন না। তবে পাখিগুলো উড়ে খাঁচা ছাড়া হতো না–হতো মরে। টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না কোনওটাই আর সয় না। এইসব দেখেশুনে মামা তো তিতিবিরক্ত।

শেষতক বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে ফেলুমামা তৈরি করলেন এক মজার যন্ত্র। আহুত, অনাহত–বাড়ির সব লোকেরই ডাকে এতে সুরেলা কণ্ঠের সাড়া মিলবে। লাভের মধ্যে লাভ, একে ছোলা-দানা খাওয়াবার খরচাও নেই।

এমনি একটি যন্ত্র-পাখি বাড়িতে পুষবে, থুড়ি, রাখবে নাকি? চটপট তবে ওই যন্ত্র তৈরির কাজে হাত লাগাও। যন্ত্রের জন্য যা-যা লাগবে তা আগে দেখে নাও ঃ

১. রোধ ঃ R_1— 47K
R_2—1.8K

২. কনডেন্সার ঃ C_1 — 2000 m F/12V
C_2 — 220 m F/12V
C_3 .047 m F/12V

৩. ট্রান্সফরমার ঃ T—আউটপুট ট্রান্সফরমার একটা

৪. ব্যাটারি ঃ 6 × 1.50 Volt.

৫. ট্রানজিস্টর ঃ M—AC 128 বা 2SB 77.S—একটা।

৬. সুইচ ঃ টেপা বা কলিংবেল একটা।

৭. স্পিকার ঃ 2" সাইজ 8Ω ইম্পিডেন্স।

এবারে কাজ আর কিছু নেই। স্রেফ নিচের জলের মতো সোজা সার্কিটটা দেখে পরপর জুড়ে দাও। ট্রানজিস্টরের এমিটর, বেস ও কালেক্টর পয়েন্টগুলি ভালোভাবে দেখে নিয়ে সংযোগ করতে হবে। নতুবা সব গড়বড় কিন্তু।

সব কাজ সারা হলে সার্কিটের যেখানে ব্যাটারিতে যোগ করার +9V লেখা আছে, ওখানে ওই পুশ সুইচে তারের একপ্রান্ত লাগিয়ে অন্যপ্রান্ত যোগ করো ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তে। নেগেটিভ প্রান্তে যোগ দেওয়ার তারটা ছবির উপরের দিকেই রয়েছে।

C_1 — 2000uF/12V
C_2 — 220uF/12V
C_3 — .047uF
C_4 — .22uF
C_5 — .1uF
M — AC128
T — Out put Transformar
S — 2" Speaker
R_1 — 47K
R_2 — 1.8K

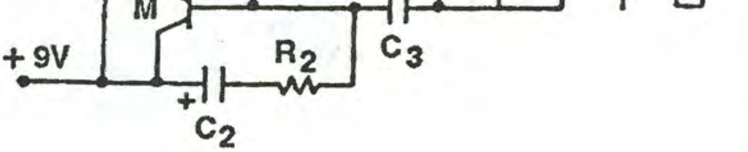

ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট

সম্পাদনা : সুজিত কুমার পাল

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

শব্দশৈলী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-এর পক্ষে ইফতেখার আমিন কর্তৃক প্রকাশিত
এবং সোবাহান প্রিন্টাস কর্তৃক মুদ্রিত। বর্ণ বিন্যাস- সাব্বির কম্পিউটার।

প্রচ্ছদ : নাসিম আহমেদ

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-70189-0017-2

KHUDY BIJJANIR PROJECT (The Making Process of Electroinc Project)
Edit by : Sujit Kumar Pal, Published By Iftekhar Amin. Shobdoshoily,
38/4, Banglabazar, Dhaka-1100. E-mail : shobdoshoily@yahoo.com.
Published February 2009. Price : 150.00 Taka.

বাংলাদেশ পরিবেশক : মনন প্রকাশ; ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

শুরুর আগে

হাতে-কলমে মজার-মজার যন্ত্র বানাবার ইচ্ছে সব কিশোর-কিশোরীর মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান মেলা আয়োজন ও তাতে অংশ নেয়া ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের অপার বিস্ময় আর নিজের আবৃষ্কিত মডেল উপস্থাপনের অদম্য আগ্রহ দেখে ভাবতাম এদের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে আমাদের আগামী দিনের বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী। কখনো কখনো কোন ইলেকট্রনিক মডেল পত্র-পত্রিকায় ছাপা হলে কত ছেলে মেয়েই যে চিঠি দিত! তাদের আগ্রহ দেখে প্রায়ই ভাবতাম।

এইসব বিচিত্র যন্ত্রের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী যদি একসঙ্গে বইয়ের আকারে ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তো কেমন হয়? ঠিক এই সময়ে বন্ধুবর ইফতেখার আমিন ঠিক এমনি একটি বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলে মনে হলো যেন মেঘ না চাইতে জল। তার আগ্রহ আর আমার সুপ্ত ইচ্ছার সমন্বয়ে বের হল এই **'ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট'**। বইটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, আগাগোড়া গল্পের মোড়কে লেখা। বাড়িতে একটা সমস্যা হয়েছে বা নিজেই সমস্যায় পড়েছে। সেই সমস্যা সমাধান করতে যন্ত্র তৈরি। আলাদা-আলাদা মজার গল্প, মজার-মজার যন্ত্র।

কিন্তু ইতিমধ্যে যুগ পাল্টে গেছে। অত্যাধুনিক সুন্দর মুদ্রণ, কম্পিউটার-স্ক্যানার এসেছে। পুরোনো টাইপ, আঁকা ছবি আর ভালো লাগছিল না। শেষপর্যন্ত পেশাদার শিল্পী কালিদাস রায় সযত্নে আগাগোড়া নতুন করে প্রতিটি মডেলের ছবি করে যথাসাধ্য নির্ভুল ও সুন্দর করার উদ্যোগ নেন।

যাদের জন্য আমাদের এত চেষ্টা, তারা খুশি হলেই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

শেষে একটাই কথা। **'ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট'** বইয়ের পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁরা পথিকৃৎ। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সুজিত কুমার পাল

ডিসেম্বর ২০০৮
ঢাকা

সূচিপত্র

ভানুমতীর খেল ৭
ইনস্ট্যান্ট কালার টি.ভি. ৯
ডানাভাঙা পাখি ১১
এস্পেশাল বাক্স ১২
অটো স্টার্ট রেডিও ১৪
অটো লক লেটারবক্স ১৫
গ্যাম্বলিং ১৭
মিনি ক্যালকুলেটর ১৮
প্রোজেক্টর ২১
ইন্টারকম সেট ২৩
আলোর মালা ২৬
রেডিও ২৭
নাচে আলো, নাচে ও ভাই ... ৩০
এলিমিনেটর ৩২
মিনি গিজার ৩৩
ক্যালিডোস্কোপ ৩৫
পানি মাপার সহজ কল ৩৬
ডি. সি. এলিমিনেটর ৩৭
রিচার্জেব্‌ল টর্চ ৩৮
ইলেকট্রনিক অর্গ্যান ৪০
ইলেকট্রনিক ছক্কা ৪৪
ইঁদুর কল ৪৬
অ্যামপ্লিফায়ার ৪৮
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মজার খেল ৫১
দেশলাই কাঠি দিয়ে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো ৫৩
ইনভার্টার ৫৪
ডিজিটাল ঘড়ি ৫৭
ইলেকট্রিক মোটর ৬২
আগুন নেভানোর যন্ত্র ৬৪
নতুন কলিংবেল ৬৫
ঘরে-বাইরে ৬৬
সাইরেন—B ৬৭
সুরেলা গ্রিটিংস কার্ড ৭৮
টিভি অ্যান্টেনা ৬৯
আতশ কাচের বদলে ৭০
কম খরচে মাইক্রোস্কোপ ৭০
টেবিল ল্যাম্প কাম নাইট ল্যাম্প ৭২
সৌরপাম্প ৭২
ম্যাচবক্স সাইজ স্ট্রবোস্কোপ ৭৪
কলিংবেলে গানের সুর ৭৫
মশা তাড়াবার যন্ত্র ৭৬
পাতা থেকে বিদ্যুৎ ৭৭
বহনযোগ্য সৌরচুল্লি ৭৮
সিলভার ডল ৮০
ইলেকট্রনিক্স স্লেট ৮১
থ্রি ডি ফটোগ্রাফি ৮২
ইলেকট্রনিক্স ডুয়েল ৮২
টর্চ ফাইন্ডার ৮৪
ইলেকট্রনিক্স গুলি ৮৫
ম্যাজিক সুইচ ৮৬

পুশ সুইচটাকে দরজার কাছে জায়গামতো বসাও আর তোমার ডানাভাঙা পাখিকে এনে সুন্দর বাক্সে বসিয়ে এমন জায়গায় রাখো যাতে সব জায়গা থেকেই শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়।

সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হল না? যিনি আসছেন তাঁর ডাকে এবার বাক্স-বন্দি ডানাভাঙা পাখিটা দেখো কেমন সুরেলা কণ্ঠে সাড়া দেয়।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

এক॥ ব্যাটারি লাগানো অবস্থায় ব্যাটারি ক্ল্যাম্পে তার সোলডার করবে না।

দুই॥ প্লাস্টিক প্লেট বা বাক্সের যেখানে স্পিকারটি বসানো হবে, সেখানে কতকগুলো ছোট-ছোট গর্ত করে দেবে।

মডেল–০৪ এস্পেশাল বাক্স

টিফিনের সময় একটু নিরিবিলিতে টিফিনের বাক্সটা খুলেই চোখদুটো রাজভোগ হয়ে গেল! আজও ফাঁকা–খাবারের 'খ' অবধি নেই।

না! আর সহ্য করা চলে না। সটান চলে এলুম বৈজ্ঞানিক (?) পাঁচুমামার কাছে। মামা বলে,–ঘাবড়াস নি। জিনিসপত্র জোগাড় কর। এ্যাক্কেরে এস্পেশাল বানিয়ে দোব।

–তাতে হবেটা কী?

–দেখই না!

পেটের তাগিদে পাঁচুমামার কোচিং-এ শুরু করে দিলাম বাক্স বানাতে।

ঠিক ধরেছি, তোমরাও চিন্তা করছ, টিফিনটা এবার থেকে আমার মতো এই বাক্সেই নিয়ে যাবে।

ব্যাপারটা কী জানো, বন্ধু যেই বাক্সটা তুলবে তখুনি শক খেয়ে গরম তেলেভাজার মতো হাত থেকে ফেলে দেবে। আর তুমি সময়মতো বাক্স খুলে তোমার প্রিয় খাবারগুলো তেলেভাজার মতো রসিয়ে-রসিয়ে খাবে। নাও, তবে বাক্সটা তৈরি করেই ফেলো।

প্রথমে একটা লজেন্সের বাক্স (টিনের) জোগাড় করো (5" × 2" × 3" সাইজের হলেই চলবে) এইবার বাক্সটার ঢাকনা খুলে রেখে ছবি নং ১-এর মতো করে ডিবের কিনারা বরাবর সেলোটেপ জড়িয়ে নাও। এটা লাগাবার কারণ, ঢাকনাটা যাতে বাক্সটা থেকে বৈদ্যুতিক ভাবে পৃথক থাকে। যন্ত্রের প্রথম পর্ব শেষ। এবার সার্কিটে হাত দাও। এতে যা-যা দরকার তার একটা হিসেব দিই।

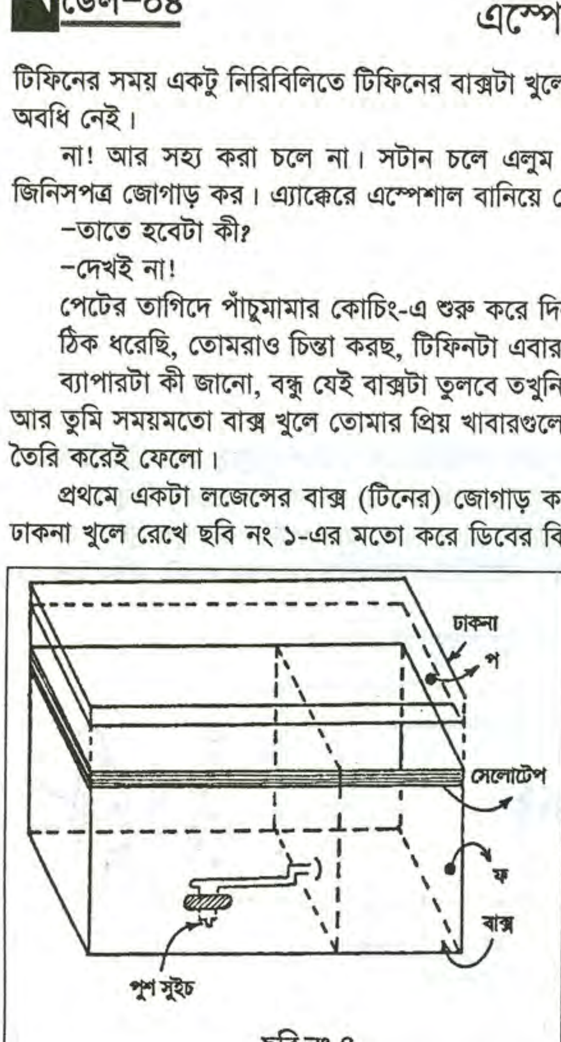

ছবি নং ৪

১. ট্রান্সফরমার T ঃ স্টেপ ডাউন ফিলামেন্ট ট্রান্সফরমার (বাজারে Centre Tag Eliminator Transformer নামে বিক্রি হয়) মান—Pri 230V, Sec, 6-0-6 V/300 mA;

২. ট্রানজিস্টর (TR) ঃ AC 128 বা Ac 188;

৩. রোধ (R) ঃ–দুই কিলো ওহমস (2KΩ);

৪. কনডেন্সার– (c) ঃ — 150 m fd/15 Vwdc Electrolytic;

৫. পুশ সুইচ (Ps) ঃ — সাধারণ অন অবস্থার (NC Type);

৬. ব্যাটারি ঃ — 1 ভাগের 1.2 Volt Cell. (1035 বা তার তুল্যাঙ্ক);

৭. বিবিধ ঃ — ব্যাটারি ক্ল্যাম্প, সোল্ডার, তার, স্ক্রু, ইত্যাদি।

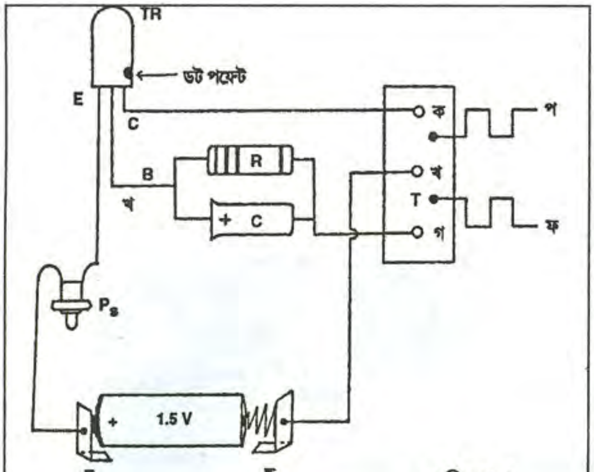

ছবি নং ২

প্রথমে ট্রান্সফরমারটি 6-0-6 দিকের যে-কোনও এক প্রান্তের (ক) পয়েন্ট ট্রানজিস্টারটির (TR) ডট পয়েন্ট সোল্ডার করো। অপর প্রান্তে (গ) রোধটির (R) যে-কোনওদিক ও কনডেন্সারের (c) নেগেটিভ প্রান্ত যোগ করো (যেমন ছবি নং ২-তে দেখানো হয়েছে)।

কনডেন্সার-এর অপর প্রান্ত রোদের আর-এক প্রান্তের সঙ্গে যোগ করে ট্রানজিস্টরের (TR) বেস অর্থাৎ ডট পয়েন্টের সব থেকে কাছের তারে সোল্ডার করো।
এবার ট্রানজিস্টরের বাকি পা leg অর্থাৎ এমিটার, সুইচের (Ps) যে-কোনও প্রান্তে যোগ করো। সুইচের বাকি পোলটি ব্যাটারি ক্ল্যাম্পের পজিটিভ দিকে (চ) এবং ব্যাটারি ক্ল্যাম্পের নেগেটিভ দিক (ছ) ট্রান্সফরমারের (T) খ বিন্দুতে সোল্ডার করো।

এবারে সার্কিটটা বাক্সে সাবধানে বসাও। সুইচটা বাক্সের তলায় গর্ত করে ১নং ছবির মতো করে লাগাও। দেখবে যেন ব্যাটারি ক্ল্যাম্পের মাঝে ঠিক cell টার মাপমতো জায়গা থাকে।

এবার ট্রান্সফরমারটির দিকে তাকাও। দেখবে 230V লেখা দিকের দুটো পয়েন্ট ('প' ও 'ফ') ফাঁকা আছে। ওই দুটো প্রান্তের একটা (ধরো 'প') বাক্সের ঢাকনার সঙ্গে এবং অপরটি (ফ) বাক্সের সঙ্গে স্ক্রু করো বা সোল্ডার করো।

প্রয়োজনীয় একটা কথা বলি, সোল্ডারিং-এর সময় দেখবে যেন কোনও তারের সঙ্গে অন্য তার না ঠেকে যায়। এবার ব্যাটারিটা ঠিকমতো ক্ল্যাম্পদুটোর ('চ' ও 'ছ') মাঝখানে বসাও। বাক্সর ঢাকনা দাও। মনে রেখো বাক্সর খেলা এবার শুরু।

এটা কীভাবে কাজ করছে দেখা যাক। যখন বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখা থাকবে, তখন সুইচটা OFF অবস্থায় থাকবে। কাজেই বাক্সটাকে হাতে ছুঁলে কিছু হবে না-কিন্তু যেই বাক্সটাকে একটু তুলবে, তখনই সুইচটা ON হবে ও বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ট্রানজিস্টরটি অসিলেটর (Oscillator) হিসাবে কাজ করবে। ফলে ট্রান্সফরমারের অন্যদিকে উচ্চ বিভব (High Voltage) উৎপন্ন হবে এবং শক খাবে।
তবে ভয় নেই, টিফিন চুরি খুব দোষের নয়–কাজেই শকটাও খুব ভয়াবহ হবে না।

মডেল–০৫ অটো স্টার্ট রেডিও

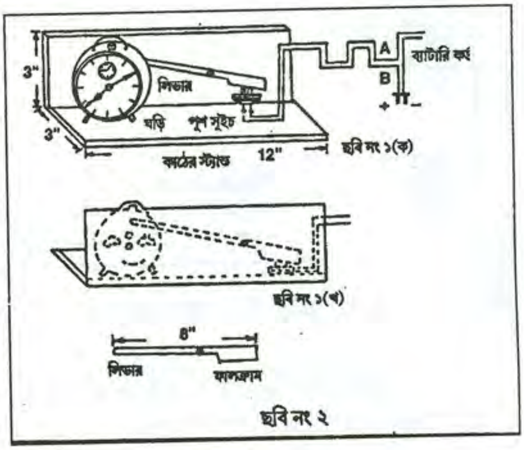

ছবি নং ১(ক)
ছবি নং ১(খ)
ছবি নং ২

রাতে খেতে বসে মেজদিই প্রথমে কথাটা তুলল ঃ এবার পূজো জামা-কাপড় চাই না, বরং সব্বাই মিলে বেড়াতে যাব।

হইহই করে সবাই মেজদির কথায় সায় দিই। বাবা, মা-ও রাজি। ব্যস, ঠিক হয়ে যায়-সাকুলার ট্রেনের টিকিট কেটে সবাই যাব দক্ষিণে। বাড়িতে থাকবে ঠাকুমা আর মেজকাকা। কমল কাকু তো রান্নার জন্যে আছেই।

পাশের বাড়ির সমররা গেছে শুধু পুরী, চিল্কা ও কোনারক। আর আমি সেখানে ঘুরব পুরো দক্ষিণ ভারত।

...কিরে সমর, খুব তো পুরী, চিল্কার কথা বলিস–দেখেছিস কি মহীশূর প্যালেস, বৃন্দাবন গার্ডেনের ফোয়ারার সামনে ফিল্মি কায়দায় ছবি তুলেছি?

সমরের কালো মুখ দেখে হাসি পায়, হেসে উঠি হাঃ হাঃ ...।

–কিরে পাগলের মতো হাসছিস কেন?

ঠাকুমার কথায় স্বপ্ন ভেঙে গেল। জড়িয়ে ধরলাম ঠাকুমাকে। ঠাকমার মুখে কিন্তু হাসি নেই। মুখ যেন কেমন ভার-ভার।

–ঠাকুমা, দুঃখ কীসের? পূজোতে থাকছি না বলে মন খারাপ?

সে তো হবেই বাবা। এই দেখ না তোরা তো চলে যাবি, আর দিনকয়েক পরেই তো মহালয়া–আমি তা শুনব কী করে? তোর মেজকাকা যখন উঠবে তখন তো মহালয়া ছেড়ে পূজো শেষ। তার জুড়ে তুই তো দেখি কত কী করিস, দে না বাবা যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করে–যাতে কানের গোড়ায় আপনা থেকেই শুরু হয়ে যায় চণ্ডিপাঠ।

মাথা চুলকে ভাবলাম, ব্যাপারটা খুব 'পুঁদিচ্চেরি'। কিন্তু বিপদটা যখন ঠাকুমার, তখন মাথা তো দিতেই হবে।

মা যখন কিল-চড় নানাবিধ মারাত্মক ধরনের বোমা নিয়ে অ্যাটাক করে, তখন তো রাষ্ট্রসং বলতে ওই 'ঠাম্মা'ই। তাই ঠিক করলাম আজকের রাতটা লড়িয়ে দেব।

সারারাত কসরত করে, ঠাকুমার মহালয়া শোনার জন্যে যেটা খাড়া করলাম তা অনেকটা ওই ছবি নং-১ (ক) এর মতো।

অ্যালার্ম-ক্লকটাকে বুক-শেল্ফের একদিকে বসালাম। নিজেই তৈরি করে নিই একটা লিভার (ছবি নং-২)। লিভারের বড় বাহুটি রয়েছে ঘড়ির অ্যালার্ম চাবির ওপর আর, অন্যদিকের ঠিক নিচে রাখি পুশ অন সুইচ [ছবি নং-১ (ক) ও (খ)]।

এবার আমাদের ট্রানজিস্টর রেডিওর ব্যাটারি কর্ডের দুটোর মধ্যে যে-কোনও একটি তারকে কেটে, পুশ অন সুইচের দু-পোল থেকে আনা দুটো তারকে, কাটা তারের দু-মুখে (A ও B) ব্ল্যাকটেপ দিয়ে জুড়ে দিই। বুক-শেল্ফটা এবার দেখতে ঠিক ছবি নং-১ (ক)-এর মতো হল।

অ্যালার্ম-ক্লকে দম দিয়ে, রেডিওটা অন করে, চুপিচুপি বুক-শেল্ফটা রেখে এলাম ঠাকুমার মাথার কাছে–।

'বন্দেমাতরম'! –রেডিওর কণ্ঠস্বরে একসঙ্গেই ঘুম ভাঙে আমার ও ঠাকুমার।

মডেল–০৬

অটো লক লেটারবক্স

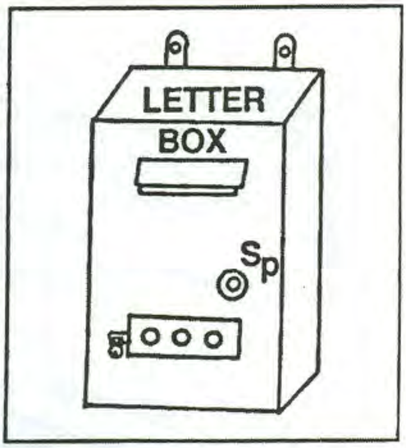

সামনে পাঁচ-ছজন বিচারক। ভাবলেশহীন মুখে তাঁরা তাকিয়ে আছেন খুকুর মডেলটার দিকে। বীরবিক্রমে খুকু বলতে শুরু করল, তার মডেল 'লেটার বক্স'। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে, ফার্স্ট প্রাইজ তার চাই-ই চাই।

আর পাঁচটা লেটার বক্স থেকে এই লেটার বক্সটা আলাদা। এর নাম দিয়েছি অটো লক লেটারবক্স।

সাধারণ লেটার বক্স-এ যদি পিওন চিঠি ফেলে যায়, আপনি জানতেও পারবেন না। তা ছাড়া, চুরির ভয়ও আছে।

কিন্তু আমার এই ছোট লেটারবক্স,–নতুন উদ্যমে শুরু করল খুকু ঃ এতে এই দুটো প্রবলেমই চমৎকারভাবে সলভ করা হয়েছে।

ধরুন পিওন এসে টুক করে চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেল। –খুকু নিজেই দেখায় ঃ অমনি, ওই দেখুন কলিং বেলটা বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠল আলোটাও। অবশ্য ইচ্ছে করলে এই ব্যবস্থাটা আপনি নাও রাখতে পারেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হল চিঠি ফেলার এই গর্তটা। –খুকুর মুখে মুচকি হাসি ঃ চিঠি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে, লক হয়ে গেল গর্তটা। চিঠি চুরির কোনও ভয়ই নেই। এবার আপনার সময়মতো আপনি চিঠিটা বার করে নিতে পারেন। নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায়।

আপনারা হাত দিয়ে দেখুনই না, কেমন লক্ হয়ে গেছে।–খুকু নিজেই ঠেলে ঢাকনাটা।

এখানে কোনওরকম ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করিনি। তাই দামেও বেশ সস্তা। –দম নেয় খুকু ঃ মাত্র একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটকে কাজে লাগিয়েই এই পুরো সিস্টেমটাকে খাড়া করেছি।

এবার বলি, কীভাবে তৈরি হল এই লেটারবক্স। একটা ১২ ভোল্টের ইলেকট্রোম্যাগনেটকে লেটারবক্সের 'ঢাকনার' ভেতরদিকে আড়াআড়িভাবে বসিয়েছি। এবার তিনটে ক্ল্যাম্প, ম্যাগনেটের ঠিক সামনের ঢাকনার ওপর একটা, আর বাকি দুটো বাক্সের গায়ে বসিয়েছি একই সরলরেখায়।

পাশাপাশি দুটো ক্ল্যাম্পের মধ্যে একটা লোহার বল্টুকে (B) স্প্রিং (S) দিয়ে এমনভাবে বসিয়েছি, যাতে ম্যাগনেটটা টানলে বল্টুটা ঢাকনার ক্ল্যাম্পের মধ্যে ঢুকে সিস্টেমটা লক করে দেয়।

তালা খুলে যেই আপনি চিঠি বার করবেন, অমনি ইলেকট্রোম্যাগনেট বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, হারিয়ে ফেলছে আকর্ষণ বল। ফলে স্প্রিং-এর টানে বল্টুটা ফিরে আসছে তার নিজের জায়গায়। লকটা খুলে যাচ্ছে।

এবার পুরো সার্কিটটা দেখুন। –স্টিক হাতে খুকু ছবির বোর্ডের দিকে এগোয় ঃ ঢাকনার ঠিক পিছন দিকে আমি একটা (N.C.P.O.) "নরম্যালি কনট্যাক্ট পুশ অফ সুইচ" (Normally contact push-off switch) রেখেছি। লেটারবক্সের নিচে লেটার ওপনার [দরজা]-এর পিছনে ঠিক কব্জার কাছে আমার তৈরি 'নরম্যালি ওপেন পুশ অন সুইচ' (N.C.P.O) সুইচটা অফ হয়ে সার্কিট ছিন্ন করবে। ফলে ইলেকট্রোম্যাগনেটটা বিদ্যুৎ-ছিন্ন হয়ে স্প্রিং-এর টানে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে।

পোস্টম্যান চিঠি ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে ঢাকনাটা উঠে গিয়ে পুশ অফ সুইচটাকে (N.C.P.O.) অন করে সার্কিটটা চালু করবে। সার্কিটের ওই রিলেটা (RL) ওর কনট্যাক্ট পয়েন্টগুলোকে চালু করবে। পুশ অফ (N.C.P.O.) সুইচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে রিলেটা (RL) এবার নতুন সার্কিট দিয়ে চালু হবে। কারণ পোস্টম্যানের চিঠি ফেলার পরেই পুশ অফ (N.C.P.O.) সুইচটা অফ হয়ে যাচ্ছে।

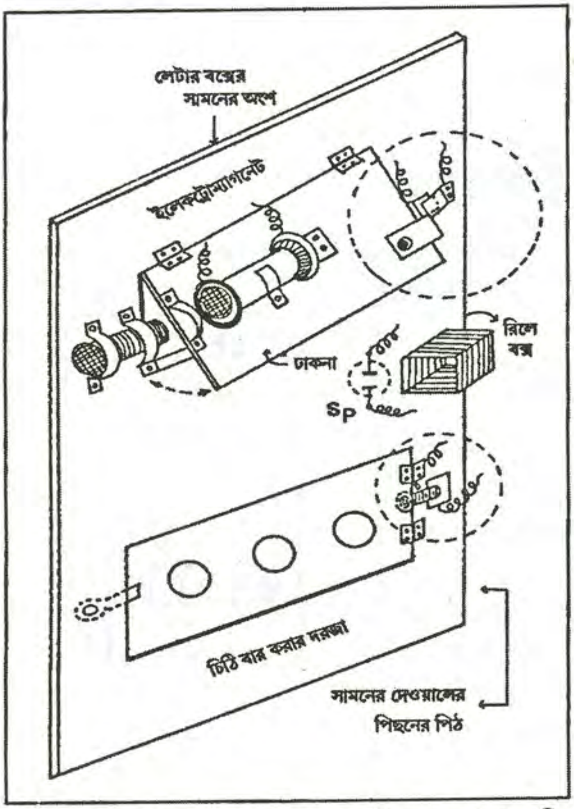

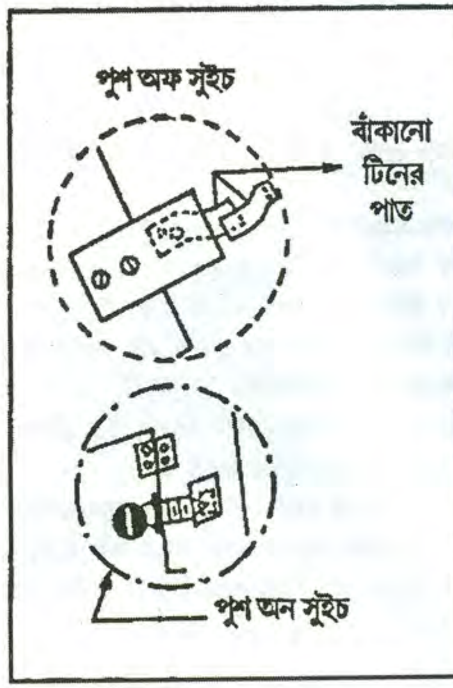

বিচারক মাথা দোলাতে থাকেন,–সবই তো বুঝলাম, কিন্তু পোস্টম্যান যদি পরপর দশটা চিঠি ফেলতে চায়, তখন কি তোমায় কড়া নেড়ে ডেকে আনবে?

তার জন্যও আমি ব্যবস্থা রেখেছি। –খুকুর মুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি ঃ সার্কিটে ওই যে দেখছেন একটা পুশ অফ সুইচ রাখা আছে ওটা পুশ করে পোস্টম্যান যত খুশি চিঠি ফেলতে পারে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পর পুশ সুইচটা টিপেও আর লক খোলা যাবে না।...

খুকু শুধু বলে,–মডেল তৈরির কৃতিত্ব আমার নয়। আমার দাদাদের। বিশ্বাস করতে চায় না কেউই।...

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-অভিনন্দনের ভারে ক্লান্ত খুকু হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। ধড়মড়িয়ে মা উঠে জল দেয় খুকুকে। খুকু আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

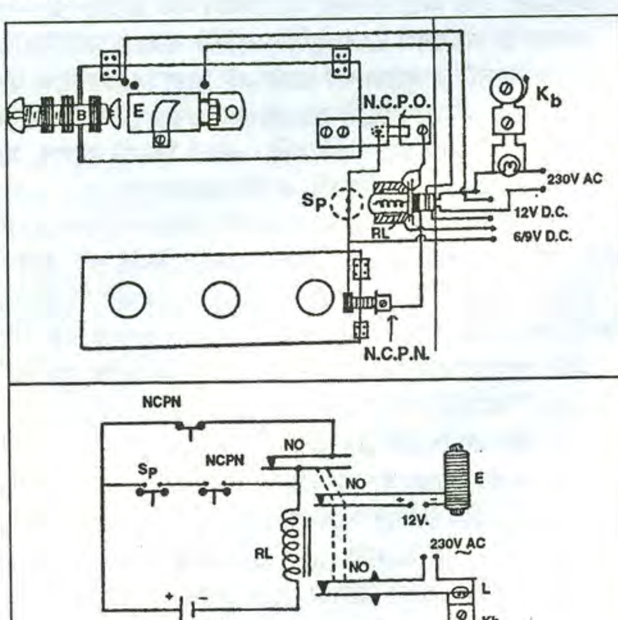

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

পিওনকে আগে থেকে জানিয়ে রাখবে ব্যাপারটা। এতে ভুল করো না। নইলে কড়া নেড়েই ঘুম ভাঙাবে তোমাদের। অথবা লেটারবক্সেও লিখে রাখতে পারো।

মডেল-০৭

গ্যাম্বলিং

তোমরাই বলো, শুধু টিফিনের পয়সায় কি গরমের মূল্যবান বিকেলগুলো চলে? কত কী কেনার আছে? অবিশ্য খাবারও আবার রকম ভেদে অনেক। যেমন ধরো, এই আইসক্রিম, ফুচকা আরও কত কী!

আবার শ্যাম থাপার ব্যাক-ভলি দেখতে গেলে কি শুধু ষাটটা পয়সায় লাইন দেওয়া যায়! বাস ভাড়াটা না হয় হেঁটেই ম্যানেজ হল। কিন্তু স্যাকারিন দেওয়া ঠাণ্ডা জল না খেলে, এক নাগাড়ে দু-তিন ঘণ্টা ঘোড়ার ক্ষুরের ওপর নজর রাখব কী করে?

তাই জমা-খরচের পাল্লা সমান করতে, বলতে লজ্জা নেই, শেষ পর্যন্ত চোখ পড়ল বোনের টিফিনের পয়সায়।

কিন্তু সহজে কি আর ওর টিফিনের পয়সা পকেটস্থ করা যায়! যতই হোক, আমারই বোন তো! তার ওপর ওর সঙ্গে আবার আমার উল্টোমেরুর সম্পর্ক। ও যদি বলে পানি উঁচু, তবে পৃথিবীর নিয়মে আমি পানি নিচু দেখবই।

তবু শেষ রাউন্ডের বুদ্ধির প্যাঁচে জয়ের মালা দুলল আমারই গলায়।

এ ব্যাপারে পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন অবশ্য বিজ্ঞানী নিউটন। আর প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন ঃ

সুহাসের বোন-খেলার গামলা দিয়ে;
গুল কয়লার পেটি-ভাঙা অংশ দিয়ে;
বুটপালিশওলা-গোটা চারেক পেরেক দিয়ে;
এবং
বোন-টিফিনের পয়সা দিয়ে।

পেটি-ভাঙা তক্তাটুকুর ওপর পেরেক ঠুকে ছ-ইঞ্চি আন্দাজ বাটাম খাড়া করলাম। তার ওপর গামলাটা বসিয়ে দিই পেরেক দিয়ে। এবার ইঞ্চি চারেক দূরে দুটো পেরেক দিয়ে (ছবির মতো) দশ ইঞ্চি লম্বা লোহার পাত (পেটি থেকে ছাড়ানো) তক্তার ওপর লাগিয়ে দিলাম। মামির দেওয়া গ্রিটিংস কার্ডটা রাখি গামলার ওপর।

বোনের সঙ্গে বাজি রইল, ও কার্ডের ওপর পয়সা রাখবে আর আমি টিনের পাত (যেটা এখানে স্প্রিং হিসেবে কাজ করছে) দিয়ে ধাক্কা দেব। যদি পয়সা গামলার বাইরে পড়ে, তবে আমার টিফিনের পয়সা সেদিন ও খরচ করবে। আর পয়সাটা যদি গামলার ভেতরে পড়ে, তবে ওর টিফিনের পয়সা আমার হাতে আসবে।

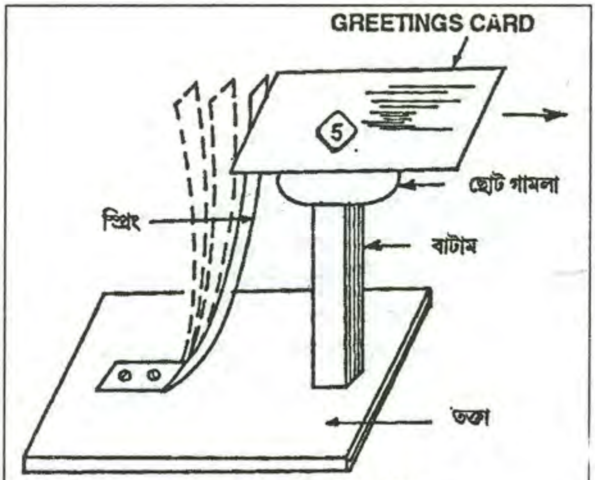

ছবি নঃ ১

সত্যি কথা বলতে কী, সেদিন থেকে বোনের টিফিনের পয়সা, মায়ের হাত থেকে আমার হাতেই আসে-বোনের হাত ঘুরে।

তোমাদের কাছে বলেই ফেলি এর কারণটা। নিউটনের কথায় ঃ স্থির বস্তু সব সময় চেষ্টা করে তার স্থির অবস্থা বজায় রাখার।

তাই পয়সা আমার মুখ চেয়ে গামলায় পড়েছে, পড়ছে ও পড়বে ...।

মডেল–০৮

মিনি ক্যালকুলেটর

ভিজে চুপচুপ হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে পল্টু যোহা আমাদের ঘরে এসে হাজির।

আরে, তুমি! –পল্টুর ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে চমকে উঠলাম ঃ কি ব্যাপার। আগে মাথা-টাথা মোছো ...

–দাঁড়া, দাঁড়া মানিকজোড়! চটপট বল তো, ৩৭৫ কে ৩৩ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?

একি মুখে-মুখে করা যায় নাকি?–পল্টুর ব্যাপার-স্যাপার দেখে ফটিক থ। আমি তো আর শকুন্তলা দেবী না।

আমি বলছি! –পল্টু সগর্বে বুক ফোলায় ঃ ১২,৩৭৫। গুণ করে মিলিয়ে নে।

আর ক্যারামতি দেখিও না। –আমি খেঁকিয়ে উঠি ঃ আগেভাগে নামতা মুখস্থ করে... করত ৭৫ কে ২৩ দিয়ে গুণ?

হাতের তালুতে কি একটার উপর হাত চালায় পেল্টুদা। তারপর মুখ তুলে হাসে ঃ ১৭২৫। কি রে, ঠিক তো? অ্যাঁ!!!–এবার সত্যিই আমরা আঁতকে উঠি।

ফটিক বিড়বিড় করে,–পল্টু এত জলদি করল কী করে রে বাবা, অঙ্কের নামে তো পল্টুর ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরে। তবে কি ওকে আর্যভট্ট ভর করল নাকি?

হুঁ–হুঁ বাব্বা। এ বড় মজার জিনিস! –থার্টি টু অল আউট করে পল্টু মাথা দোলাতে থাকে।

আর সইতে পারি না,–দেখি, হাতের ও জিনিসটা কী?

ও তোরা বুঝবি না, গবেট হাঁদারাম! –সটান বেরিয়ে গেল পল্টু।

দাঁত কিড়মিড় করে ফটিক,–ঠিক আছে, এর জবাব ওকে দেব।

–ঠিক বলেছিস।

পরদিন সকালের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই ছুটলাম আদি অকৃত্রিম আমাদের নবীন কাকু এর কাছে।

–কী ব্যাপার বলুন তো! 'ফটিক দি গ্রেট' গতকাল মুখে-মুখে গুণ করে দিল!

নবীন কাকু হাসেন ঃ ওমা, ওটা তো তোমরাও করতে পারো। বিজ্ঞান আজ কোথায় গিয়ে পৌছেছে, কিছুই তো জানো না বাছারা! ফটিক আর অঙ্ক শিখল কোথায়? কাল ও তো আমার কাছ চেয়ে নিয়ে গেল 'ক্যালকুলেটর', তোমাদের ভেলকি দেখাবে বলে।

তবে দিন না, একটা তৈরি করে। –ফটিক ছেলেমানুষের মতো আব্দার ধরে ঃ আমরাও ওকে মজা দেখাব।

তোমরা পারবে না! –করুণার হাসি হাসেন নবীন কাকু ঃ এ জাতীয় ক্যালকুলেটর বাজারে

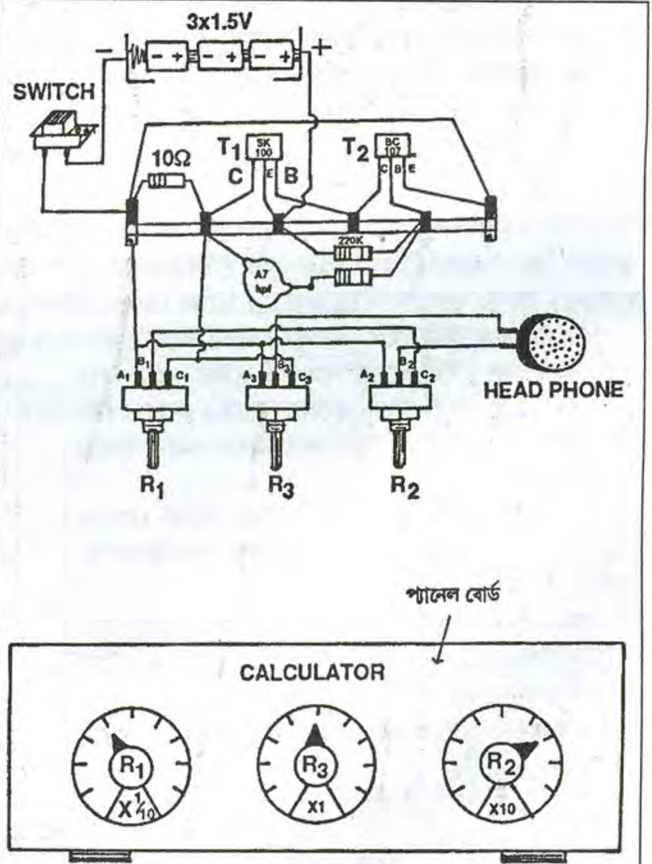

ছবি নং ২

মেলে। ওতে অনেকরকম দামি-দামি ইলেকট্রনিক যন্ত্র থাকে, যেমন ডিজিট্যাল ডিসপ্লে ইউনিট, ইন্ট্রিগ্রেটেড সার্কিট... এইরকম কত কী। তবে সহজে তোমাদের বাতলে দিতে পারি একটা যন্ত্র, যাকে 'মিনি ক্যালকুলেটর' বলা যায়। এতে শুধু গুণভাগ চলতে পারে। হবে তো?

হ্যাঁ–হ্যাঁ ওতেই হবে!–তড়াং করে লাফিয়ে উঠি ঃ পল্টুর বিদ্যের দৌড় জানা আছে। তড়িঘড়ি বলুন তো, কী-কী জোগাড় করতে হবে?

ফটিক বসে পড়ে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে।

নবীন কাকু ঢাউস পেটমোটা এক ফাইল থেকে একটা কাগজ বের করলেন। কীসব আঁকা আছে তাতে। কী-কী লাগবে লিখে নাও তোমরা। –নবীন কাকু শুরু করেন ঃ

১. ট্রানজিস্টর —SK 100 (T1) ও BC 107 (T2)

২. রেজিস্ট্যান্স —10Ω (ওহ্‌ম্‌স্‌), 1K W ও 220 K W.

৩. ক্যাপাসিটর —4.7 Kpf.

৪. লিনিয়ার পোটেনশিওমিটার — 100 Ω, 10K Ω 1K Ω

৫. হেডফোন, ব্যাটারি, পয়েন্টার নব (তিনটে), সুইচ ইত্যাদি।

এই ক্যালকুলেটরের দুটো ভাগ-অসিলেটর ও পোটেনশিওমিটার। অসিলেটরের কাজ হল একটা উচ্চ কম্পাংকের সিগন্যাল তৈরি করা, যা পাঠানো হবে পোটেনশিওমিটারে। এই পোটেনশিওমিটারে আবার তিনটে পোটেনশিওমিটার আছে (R_1, R_2 ও R_3)। প্রথম পোটেনশিওমিটারে বলতে বোঝানো হয়েছে এমন এক যন্ত্রকে, যা দিয়ে আমরা Potential বা বিভব তুলনামূলকভাবে মাপতে পারি।

ঠিকমতো গুণভাগ করতে হলে দরকার, সঠিক ক্যালিব্রেশন (Calibration)-এর। তার জন্য প্রতিটি পোটেনশিওমিটারের রোটেশনাল রেঞ্জ বার করে তাকে 100 ভাগে ভাগ করবে।

রোটেশনাল রেঞ্জ বার করবার জন্যে পোটেনশিওমিটারগুলোকে নব সমেত একটা কাগজের উপর রাখবে। এবার রডটা বাঁ-দিকে যতদূর ঘোরানো যায়, ততদূর নিয়ে গিয়ে কাগজের ওপর সেখানে একটা বিন্দু দেবে।

এবার উল্টোদিকে যতদূর যায়, নিয়ে গিয়ে আর একটা বিন্দু একইভাবে দেবে। এবার পোটেনশিওমিটার রডের অবস্থানের কেন্দ্রস্থলে একটা বিন্দু ধরে আগের দেওয়া বিন্দুদুটোর সঙ্গে যোগ করো।

এইভাবে যে প্রবৃত্ত কোণ উৎপন্ন হল, তা চাঁদা দিয়ে মেপে নেবে। পোটেনশিওমিটারের এটাই হচ্ছে রোটেশনাল রেঞ্জ। সাধারণত এর মান হবে 300°। কাজেই ওই 100 ভাগের 1 ভাগের মান হয় 3°।

একটা পরিষ্কার পিচবোর্ডে কাগজ সেঁটে ডায়ালগুলো এঁকে নাও। ব্যাস 3" করবে। নইলে ক্যালিব্রেশনে অসুবিধে হতে পারে।

বাব্বা!–ফটিক গগিয়ে ওঠে ঃ আর কতদূর?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ! শেষ হয়ে গেল তো?

আরে, না–না! নবীন কাকু আমাদের আশায় ছাই ঢেলে দেন ঃ এ তো গেল পোটেনশিওমিটারের কথা। এবার অসিলেটরের কথা শোন!

T_1, T_2 ট্রানজিস্টরদুটোকে একটা ট্যাগবোর্ডের উপর এমনভাবে বসাবে, যাতে T_2 -এর বেস ও T_2 -এর কালেক্টর এক পয়েন্টে থাকে। [ছবি নং 1] T_1-এর কালেকটর 10 Ω ও 4.7 Kpf-এর সংযোগ পয়েন্টে ঝেলে দেবে। 4.7 Kpf-এর অন্য পোলটা 1K Ω-এর সঙ্গে সিরিজে জুড়ে T_2-র বেস-এ লাগাবে। T_1-এর এমিটার 220 K Ω হয়ে T_2-র বেস-এ আসবে। ব্যাটারি ক্ল্যাম্পের পজিটিভ (+) দিকটা T_1-এর এমিটারে দেবে। 10 Ω–এর খোলা মাথাটা যাবে T_2-র এমিটারে। এই পয়েন্ট থেকেই একটা তার বেরিয়ে সুইচ হয়ে ব্যাটারি ক্ল্যাম্পে যাবে। T_2-র এমিটারে 10 Ω–এর সুইচের দিকের সঙ্গে তার দিয়ে জুড়ে দেবে।

ব্যস, অসিলেটার-এর সার্কিটের দিকটা শেষ।

যাক। –হাঁফ ছাড়ি আমরা।

দাঁড়াও–দাঁড়াও। –নবীন কাকু পূর্ণোদ্যমে শুরু করেন ঃ

এবার প্যানেল বোর্ডে (ছবি নং ২) R_1, R_2 ও R_3 ডায়াল সমেত লাগবে। তোমাদের সুবিধের জন্যে A_1 B_2 C_3... করে পোটেনশিওমিটারে ট্যাগগুলোকে নাম্বার করে দাও।

কী করবে শোনো ঃ

১) A_1, B_2 ও A_3 শর্ট করে T_2 -র এমিটার ও 10Ω-এর সংযোগে নিয়ে যাবে।

২) B_1 ও A_3 শর্ট করবে। B_2 ও B_2- কে হেডফোনে দেবে।

৩) C_1 ও C_3 শর্ট করে T_1 -এর কালেক্টরের পয়েন্টে পাঠাবে।

যন্ত্রটি তৈরি হলে এটাতে কিভাবে গুণ বা ভাগ করবে বলি। এই পর্যন্ত বলেই নবীন কাকু কাগজ পেন্সিল ধরলেন ঃ

যেহেতু, $R_1 : R_2 : R_3 = 1 : 10 : 100 = 1,10 : 1 : 10$.

সেহেতু, R_1 যা দেখাবে তাকে 10 দিয়ে ভাগ করতে হবে আর R_3 যা দেখাবে তাকে 10 দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধরো, 50 কে 6 দিয়ে তোমরা গুণ করতে চাও। R_1-কে ঘুরিয়ে 60-এ নিয়ে যাবে, অর্থাৎ ৬-এ $50 \times 1,10$

R_3-কে রাখবে 50-এ আর R_2- কে সরিয়ে এমন জায়গায় আনবে যেখানে হেডফোনের আওয়াজ ঠিক বন্ধ হয়ে যায়। দেখবে R_2-এর ডায়াল দেখাবে 30। অর্থাৎ $30 \times 10 = 300$। কেমন?

ধরো, 560-কে 7 দিয়ে ভাগ করতে চাও। তখন, -কে রাখবে 56-তে $(56 \times 10 = 560)$। R_1- কে রাখবে 70 এ, আর R_2 ঘোরাতে থাকবে যতক্ষণ না হেডফোনের আওয়াজ বন্ধ হয়। এখন R_3 -র কাঁটা দেখাবে 80 $(560 \div 7 = 80)$।

কি, জিনিসটা বোধগম্য হল?

জবাব নেই। থ্রিচিয়ার্স ফর-সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলাম।

নবীন কাকু। হিপ-হিপ হুররে! –ফটিক যোগ করে।

পরের দিন সকালে দুজনে সোজা সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরে। প্রসঙ্গত বলি, সকালে স্যার যখন প্রাতঃকৃত্যে যান, সেসময় পল্টু স্যারের ঘরে অধিষ্ঠান করে। দেখি, ব্যাটা লাটসাহেবের মতো 'স্যারে'র চেয়ার হেলান দিয়ে বসে মৌজসে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে সারা পৃথিবীটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে।

আমাদের দেখে প্রশ্ন করে,–কী ব্যাপার, সাতসকালে মানিকজোড়?

তর সয় না ফটিকের। হুট করে প্রশ্ন ছোড়ে,-বল-না, কাকে দিয়ে কতকে গুণ করতে হবে?

তা তোরাও একটু ক্-ক্যালকুলেটার কিনলি নাকি?-তোতলাতে শুরু করে ফটিক।

–না দাদা-না, আমাদের ট্যাঁকের ওজন তোমার মতো নয়। তাই নবীন কাকুর পরামর্শে নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছি।

মডেল–৪৫ ইলেকট্রনিক্স স্লেট

কাল টুম্পার জন্মদিন। কিন্তু সেটা একটা বড় খবর নয়–বড় খবর আমাদের বাড়ির সব থেকে ছোট মেম্বারের কাল হাতে ঘড়ি। তার আয়োজনে দাদু এনেছেন রঙিন পেনসিল আর ভাই স্লেট!! সে আবার ম্যাজিক বোর্ড! যতই দাগ দাও, কাঠি ঘষলেই হাওয়া।

কিন্তু টুম্পার ঠিক পছন্দ নয়! বাবা কত কী তৈরি করে আর আজ বোনের হাতেখড়িতে সেই পুরোনো আমলের সেলেট-পেনসিল।

চলবে না, চলবে না।

কী করি, অফিস যাওয়ার আগে গুঞ্জনটা কানে এল-ওর সঙ্গে দল বেঁধেছে পাশের বাড়ির দোলন, বাবাই।

মা বেরোবার সময় বলল,–যা হোক, একটা কিছু আনিস। না হলে দেখছিস তো-কী কাণ্ড। হাতে পোস্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

হবে, হবে নতুন কিছুই হবে। –এই বলে বেরিয়ে পড়লাম–অফিসের উদ্দেশ্যে। ফেরার পথে চাঁদনি ঘুরে নিয়ে এলাম 32টা LED লার রঙের, ব্যাটারি ক্ল্যাম্প 3 Volt-এর, দুটো পেনসিল ব্যাটারি, বেশ কিছুটা হুকআপ তার, ছোট প্লাস্টিকের ডিবের ঢাকনায় LED গুলো ছবির মতো করে সাজিয়ে ষোলোটা পিয়ানো সুইচের সঙ্গে যুক্ত করলাম।

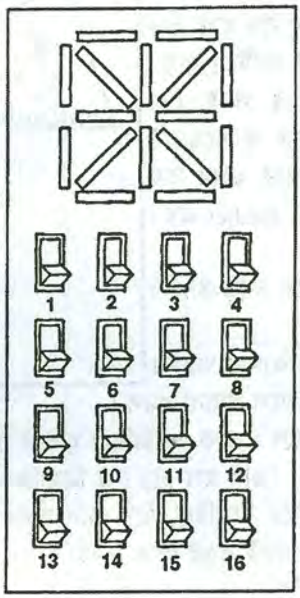

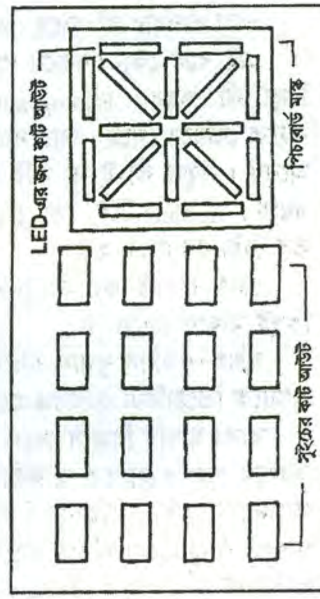

–মাই ইলেকট্রনিক্স স্লেট ইজ রেডি। সবাই চলে এসো—A to Z সবই লেখা যাবে। শুধু সুইচ টিপেই।

কিন্তু?–এই 'কিন্তু'-টাই মা বলে দিল।

বাংলায় 'অ' 'আ' 'ক'

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

১। কোন-কোন সুইচ টিপলে কোন-কোন অক্ষর হবে তার একটা তালিকা দিলাম।

২। পিচবোর্ডের মাস্ক বানিয়ে লাল চকমকে কাগজ লাগাতে হবে মাস্কের ওপর। তারপর কেমিক্যাল আঠা ব্যবহার করে প্লাস্টিকের বাক্সের ওপর দিকে চৌকো করে লাগিয়ে নিতে হবে। প্লাস্টিকের বাক্সের ঢাকনায় নিচের দিকে নম্বর অনুযায়ী সুইচগুলো বসিয়ে নিতে হবে।

৩। ব্যাটারি ক্ল্যাম্পে ব্যাটারি ভরে হুকআপ তার লাগিয়ে সার্কিট অনুযায়ী লাগাতে হবে।

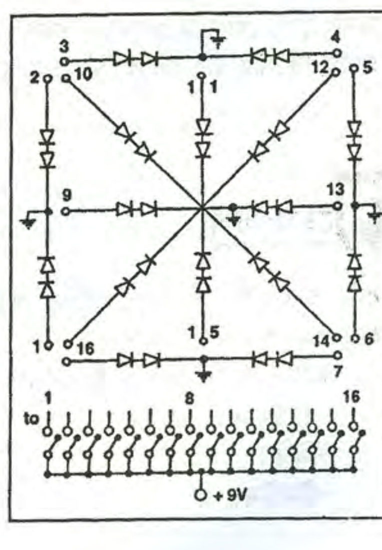

মডেল–৪৬

থ্রি ডি ফটোগ্রাফি

ঘরে ঢুকতেই কিশোর পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর আনিস একতাড়া চিঠি ছুড়ে দিল আমার দিকে।

–কী! এবার পড়ো। আমি উত্তর দিতে-দিতে ক্লান্ত। খালি ইলেকট্রনিক্স সার্কিট দিলে হবে না। আমার ফটোগ্রাফির পাঠকরা তো 'নো কনফিডেন্স' ডাকবে। একটা কিছু করো।

–তা ভাববার কী আছে। আর সব খবর কী?

এই বলে কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে যাই। কিন্তু কী করব। Photography-র সবই তো বইতে বেরিয়ে গেছে। আর বাজারে এ নিয়ে বই অনেক। নতুন কী-ই বা করি। তার ওপর কম খরচে। Subject-টাই তো High Budjet-এর। তবু চেষ্টা চালাতেই হবে।

রোজ রাতেই ক্যামেরাটা নিয়ে নাড়ি-চাড়ি। কিছুই মাথায় ঢোকে না।

হঠাৎ–একদিন বুলান ওরফে আমার ভাগনা আমাকে ভিক্টোরিয়া দেখাতে হবে বলে বায়না ধরল।

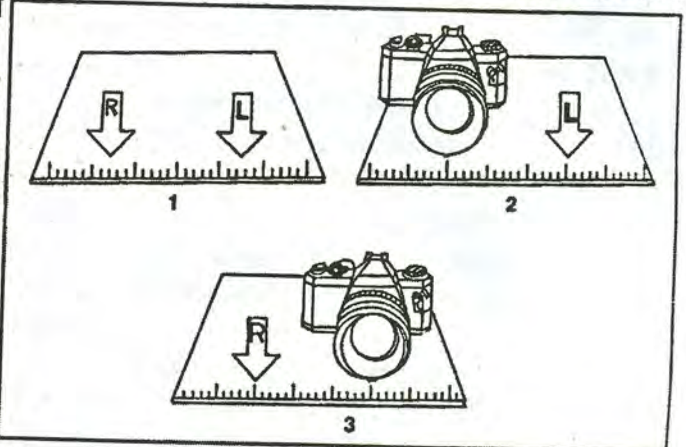

ব্যস! মাথায় বিজলি খেলে গেল। ওকে ভিক্টোরিয়া ঘুরিয়ে দেখাব ঠিক করে ক্যামেরাটা নিয়ে বসে গেলাম। যা-যা করলাম পরপর ছবিতে আঁকলাম। তৈরি হল 3D (বা ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার মেশিন)। তবে কিছুই নেই এই যন্ত্রে। ক্যামেরাটা একটা প্লাইবোর্ডে বসিয়ে তিরচিহ্ন এঁকে ছবি তুলব একটা। এরপর দুটো চোখের যা দূরত্ব-সেই দূরত্বে পাশাপাশি ক্যামেরা সরিয়ে উঠবে একই বস্তুর আর একটা ছবি। এবার এই ছবিদুটো চোখের থেকে সমান দূরত্বে রেখে তাকালেই দেখা যাবে ত্রিমাত্রিক ছবি।

এবার তৈরি করতে হবে ছবি দেখার যন্ত্র। যা ছবি নং ২-এর মতো করে কার্ডবোর্ড কেটে তৈরি করে নেওয়া যাবে অনায়াসে। খেলনার দোকানে অবশ্য এই ধরনের Viewer পাওয়া যায়। তা কিনে নিলেও চলবে। ছবি তোলার সময় স্লাইড ফিল্মের ছবি তোলা উচিত না হলে প্রোজেক্টরের চেহারা বিরাট হয়ে যাবে।

মডেল–৪৭

ইলেকট্রনিক্স ডুয়েল

বাড়িতে এল ভি. সি. পি.। ঝাঁপিয়ে পড়ল বুবাই টুম্পা মোনাই–এ বলে ব্যাটম্যান ও বলে মিক্কি। আর একজনের লরেল হার্ডি তো অন্যজন টিনটিন।

আমি বলি-যে-কোনও একটা ঠিক করে বল।

–ব্যাটম্যান!

–মিক্কি!

–টিনটিন!

–না না! টিনটিনই হোক। –নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুম্পা।

–কেন? মিক্কির কথা বোঝো না নাকি–হুঁঃ টিনটিন! কী বুঝিস রে তুই?

–অ্যাই, একদম নাক গলাবি না, ব্যাটম্যান ছাড়া আমি দেখব না–তোদেরও দেখতে দেব না।

ব্যস–লেগে যা 'নারদ' 'নারদ'।

ধুমধাপ–ধুপধাপ–ত্রিভুবন মাথায় উঠল।

–নো, নো, নো, নো-নট বাই হ্যান্ড, বাট বাই–

আমরা চমকে পেছন ফিরে দেখি, নান্নু ভাই হাতে একটা প্লাস্টিকের পাতলামতো বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে। চমকে ঝগড়া বন্ধ করে সব চুপচাপ।

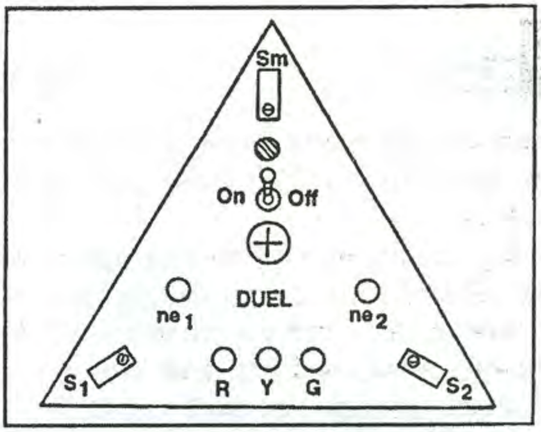

কিন্তু–একটু পরে নতুন উদ্যমে মুখ খুললাম আমি, ব্যাটম্যানই হবে নতুন ভি.সি.পি.-তে।

ব্যস! আবার লেগে গেল ঝগড়া।

দাঁড়াও বৎসরা! আজ সমস্যার সমাধান করতে হাজির এই ইলেকট্রনিক ডুয়েল!–নান্নু ভাই গম্ভীরকণ্ঠে বললেন ঃ

–দুজন করে চলে এসো। সুইচদুটোতে হাত রাখো। (S_1S_2)। যেই স্টার্ট বলে আমি এই লাল LED জ্বালব–টিপবে সুইচদুটো। যার আলো জ্বলবে (Ne1 Ne2), তার বুকে লাগল গুলি–মানে তার কথা শেষ। এবার যে জিতবে তার সঙ্গে খেলবে আরেকজন। একই নিয়মে। এইভাবে যে বেঁচে রইল শেষপর্যন্ত, তারই কথামতো চালান হবে ক্যাসেট।

ব্যস রেডি, এবার শুরু হোক খেলা। কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট গিয়ে পড়ল ডুয়েলের ওপর।

–না, আগে ডুয়েলের সার্কিট চাই। তারপর খেলা। নান্নু ভাই কিন্তু কিছুতেই বলল না তার কারসাজি। আমি তখনকার মতো চুপ করে গেলাম।

কিন্তু খেলার পরেও বিতর্ক রয়ে গেল–সিনেমা চলবে, ডিনারের আগে না পরে!

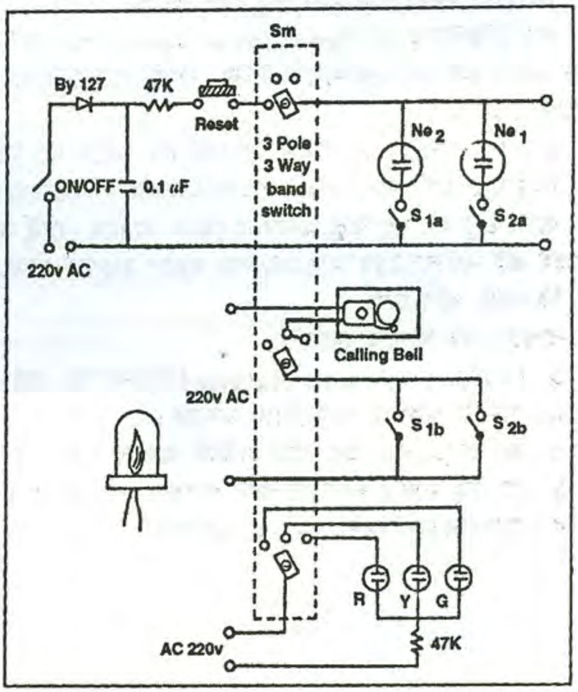

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

১। সার্কিটটা ছবিতে আঁকা আছে। বর্তনীর যোগাযোগ একটু মোটা তারে করবে।

২। ব্যান্ড সুইচ (Ss) সরাসরি 230V A.C.-র সঙ্গে যুক্ত, তাই প্রত্যেকটি Connection খুব যত্ন করে করবে। প্রয়োজনে Black tape বা Sleeres ব্যবহার করবে।

৩। প্লাস্টিকের টিফিন ডিবেতে সুইচ (S_1 S_2) ও Reset Switch (Sp) শক্ত করে লাগাবে।

৪। লেআউট নিজের পছন্দমতো করতে পারো। তবে চেষ্টা করবে যাতে তার কম লাগে।

মডেল–৪৮ টর্চ ফাইন্ডার

...আজ রাজ্যে বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল 250 মেগাওয়াট, যার মধ্যে ...

ব্যস, লোডশেডিং!–দাদু চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ উঃ, খবরটাও একটু মন দিয়ে শুনতে দেবে না। হারু, টর্চটা দে তো-টি ভি.-টা বন্ধ করি।

কিন্তু হারু, মানে দাদুর পেয়ারের চাকর, টর্চটা যে কোথায় রেখেছে মনে করতে পারে না। প্রথমে ফেলল দাদুর পানির গেলাস, স্টিলের ছিল বলে এ যাত্রায় বেঁচে গেল। কিন্তু তারপরই ঝনাৎ করে পড়ল চিমনিটা, সারা ঘর কাচে কাচ।...

অবশ্য এ ঘটনা রোজই আমাদের বাড়িতে ঘটে, কিন্তু কারওরই মাথাব্যথা নেই। সবাই ভালো চাকরি করি, তার উপর দাদুর পেনশন, সব মিলিয়ে রোজই কাচের গেলাস, কাপ, হ্যারিকেন যা ভাঙে ঠিক-ঠিক চলে আসে।

অতএব দাদির হুকুম,–হয় এমনই আরেকটা নিয়ে এসো, না হলে একটা বিহিত করো।

পরের দিন নিলামের দোকানের সামনে দাঁড়াল আমাদের গাড়ি। দাদু আর আমি অনেক খুঁজলাম–নাঃ! পাওয়া গেল না।

অতঃপর এখন আমি আর দাদু ব্যস্ত 'বিহিত' করতে।

চার ট্রাঞ্জিস্টরের এই Power failure alarm circuit এখন আমাদের ভরসা। টিফিন ডিবেতে ব্যাটারি সমেত ভরে নিচে একটা হুক দিয়ে ঝোলালাম টর্চটা। হুকটা লাগিয়েছিলাম একটা ডাবল সাইডেড কপার ক্ল্যাড বোর্ডের মাঝখানে। (সাইজ ১.২" × ১.২"।

যেই আলো চলে যাবে সার্কিট আওয়াজ শুরু করবে আর সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠবে LED (L), ফলে হারু ঠিক খুঁজে পাবে টর্চ। কিন্তু হারু হ্যারিকেন জ্বেলেই স্বভাবসিদ্ধভাবে টর্চটা যেখানে খুশি রেখে দেবে। তাহলে? পরে কী করে খুঁজে পাবে টর্চ?

বটে! তাই না! যন্ত্র কিন্তু অন্যকথা ভেবে রেখেছে। যেই আলো আসবে আবার বাজবে স্পিকার, সঙ্গে জ্বলবে LED। কাজেই এই দ্বিতীয়বারের আওয়াজ বন্ধ করতে হারুকে খুঁজে বার করতেই হবে টর্চ।

কি দাদি, খুশি তো!

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

১। Double sided copper clad board যদি না পাও তো মোটা টিনের পাত স্প্রিং দিয়ে বসিয়ে সুইচ বানিয়ে নেবে।

২। সার্কিট অবশ্যই ভেরোবোর্ডে বসাবে।

৩। শুধু লোডশেডিং-এর সময় ব্যাটারি ব্যবহার হবে তাই নয়, ভোল্টে পকেট সাইজ ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারো।

৪। যে হুক মশারি খাটাবার জন্য ব্যবহার করা হয় তাই দিয়ে প্যাঁচ কেটে সুইচ তৈরি হবে।

৫। সাবধানতার জন্যে A.C.-র সঙ্গে একটা পিয়ানো সুইচ (on/off) লাগাবে।

মডেল-৪৯

ইলেকট্রনিক্স গুলি

স্থান-দুর্গাপুজোর মণ্ডপ।
কাল-সপ্তমী, সকাল আটটা।
পাত্র-সদাই ও গদাই।
দশা-পিলের মধ্যে গুলি। সদাই দেকিয়ে দিল, কোনটা মারতে হবে, গদাই ঠিক ছুড়তে যাচ্ছে তার গুলি। ঘটনা বা দুর্ঘটনা-দূর থেকে একটা স্কুটার গুলির ওপর দিয়ে ঝাঁ করে বেরিয়ে গেল। ছিটকে পড়ল গদাই। সদাই লাফিয়ে বাড়ির দিকে দে ছুট।

দর্শক-দোতলায় দাঁড়িয়ে মা আর আমি।

এই ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে পরের অবস্থাটা বিবেচনা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মা হাঁক পাড়ল। গদাই, সদাই ভয়ে পাংশু। আজ থেকে গুলি খেলা বন্ধ,-বলে মা ফতোয়া জারি করল। অতএব পুরো পুজোটা মাটি।

ঘটনার দশ মিনিট পর কাঁদ-কাঁদ মুখে গদাই সরাসরি আমার কাছে এসে বলল ঃ বড়দা, সবই তো দেখলে। আমাদের আর বেঁচে থেকে লাভ কি? যদি গুলিই না খেলতে পেলাম, আর কী হবে পৃথিবীতে থেকে! আমি সুইসাইড করব!

কাঁদ-কাঁদ সদাইও বলে,-দাদা, যদি সুইসাইড করিস তো আমায় সঙ্গে নিস।

আমি শারদীয়া হাতে বসে থাকলেও ওদের মনের দুঃখের কথাটা কিন্তু বুঝেছিলাম ঠিকই। তাই ওদের মতো তোমাদেরও দশা যাতে একই না হয় সেজন্যেই এই খেলার জন্ম।

এখানে নিয়ম বলতে একটাই। গুলি দশটা (LED) টুপটাপ জ্বলতে থাকবে এক-একবার একটা করে। সেদিনের সদাই-এর ভূমিকায় যে থাকবে তার কাজ হল, দশটা গুলির একটা দেখানো (অবশ্য নম্বর বলে দিলেই হবে)। আর গদাই নামক ছেলেটি PUSH লেখা সুইচটা এমন সময় টিপবে যেন ওই নম্বরের LEDটা ঠিক তখন জ্বলে।

ফল-LEDটা জ্বলে থাকবে।

মানে-গদাই দু-পয়েন্ট পাবে। আগে পরে হলে গুলির বদলে দুটো পয়েন্ট ফেরত পাবে সদাই।

অবশ্য হাত পাকানোর সময় Tempo লেখা নবটা ঘুরিয়ে LED গুলোর আনাগোনা কমবেশি গতিতে করা যাবে।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

১। সার্কিট দেখে LED গুলো একটা প্লাস্টিকের বাক্সে পরপর লাগিয়ে নিতে হবে।

২। পুশ Sp থাকবে LED গুলোর ঠিক নিচে।

৩। টেম্পো লেখা নবটা, VR (100K) নিজেদের সুবিধামতো বাক্সের যেখানে খুশি লাগাতে পারো।

৪। ছবি নম্বর Í1" দেখে সার্কিটটা ঠিকমতো ঝালবে। তবে IC দুটো সরাসরি না ঝেলে পকেট ব্যবহার করো।

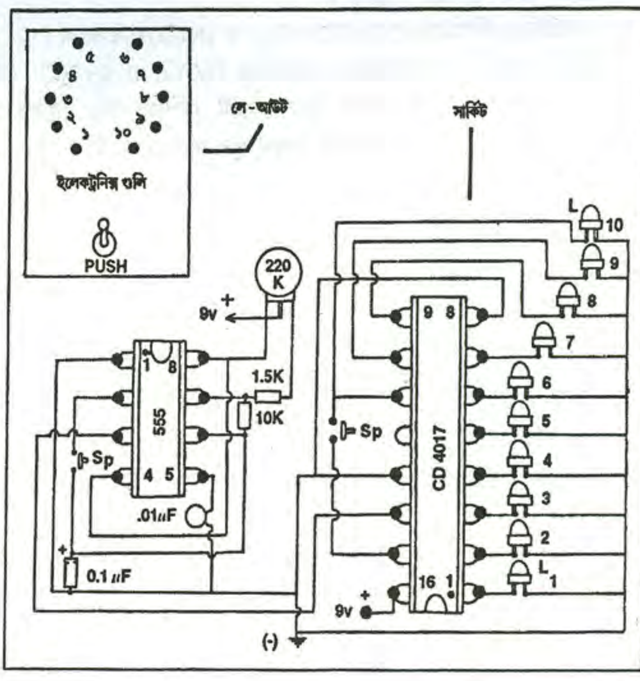

মডেল-৫০

ম্যাজিক সুইচ

'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায়'...'আর দাদা বলবেন না!' আমাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল সুবীর। কারণটা ও বুঝতে পেরেছে। আমার বাড়ি থেকে ওর বাড়ি দেখা যায়। আর আলো আসতেই জ্বলে উঠেছে ওর বাড়ির আলো। জায়গাটা রাবাঙলা–আট হাজার ফুট ওপরে–

ভারতের শেষপ্রান্তে। যে-কোনও সময় ভূমিকম্প হলে দুফাঁক হয়ে চীনে চলে যেতে পারে।

জানি, দাদা, কী করব! বসে স্টিরিও শুনছিলাম। হঠাৎ আলো চলে গেল। আঁধারে হাতড়িয়ে-হাতড়িয়ে টর্চ হাতে বেরিয়ে এসেছি। আলো নেভানোর কথা বেমালুম ভুলে গেছি। আলোর কথা ছাড় ন দাদা-কবে না আমার স্টিরিওটা এইভাবে খারাপ হয়ে যায়।

ওর অবস্থা আমি বুঝি। টেলিফোনে কাজ করে। হাতে অফুরন্ত সময়-তাই 'একটু-আধটু' আমার বাড়ি বেড়াতে আসে। আমাদের এই রাবাঙলায় আলো কখন আসে, কখন যায় কেউ বলতে পারে না। তাই ওর খুব চিন্তা যে, একদিন হয়তো এই আলো আসা-যাওয়ার ঝাঁকুনিতেই না ওর স্টিরিওর বারোটা বেজে বসে থাকবে। অতএব বেচারার কথা ভেবেই আমাকে বসে পড়তে হল। আমার যন্ত্রপাতি ঘেঁটে তৈরি করতে বসলাম একটা সুইচ। যখন আলো থাকবে, এই সুইচ (Sp) টিপে চালু করবে স্টিরিও। আর আলো চলে গেলে ভয় নেই, বন্ধ করতে হবে না স্টিরিও।

কারণ আবার যখন আলো আসবে দেখা যাবে স্টিরিও বন্ধই আছে। যতক্ষণ না আবার Sp টিপে চালু করছে। যন্ত্রটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে–আর সুবীরই আদর করে নাম রেখেছে 'ম্যাজিক সুইচ'।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

১। ব্যাটারি এলিমিনেটরের বাক্সে TQ ও IN4001 বসাবে।

২। যদি বাক্সর মধ্যে জায়গা থাকে তবে রিলেটা ও Sp সুইচ বাক্সের মধ্যে বসতে হবে।

৩। Sp সুইচের মাথাটা অর্থাৎ পুশ পয়েন্ট এলিমিনেটর বাক্সের সামনের প্যানেলে বসবে!

৪। পাওয়ার কানেকশন করবার সময় খুব সাবধানে ঝাল দেবে যাতে বিপদ না ঘটে।

মডেল–৩৭ টেবিল ল্যাম্প কাম নাইট ল্যাম্প

অনেকই রাত্রিবেলা হালকা আলো জ্বালিয়ে ঘুমোয়। আমার পড়ার টেবিলে একটা টেবিল ল্যাম্প আছে। সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ একদিন একটা পরিকল্পনা মাথায় জেগে উঠল।

আচ্ছা, এই ল্যাম্পটাকে যদি নাইট ল্যাম্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, তাহলে তো বেশ সুবিধেই হয়।

যেমনি চিন্তা, অমনি মাথায় প্ল্যান আর খাতায় আঁকিবুঁকি। টুকলু-বুকুনের জন্যে তোফা বড়দিনের উপহারও হয়ে যাবে, একইসঙ্গে।

ডায়োড এ. সি. ভোল্টেজকে ডি. সি. অর্থাৎ অল্টারনেটিভ কারেন্টকে ডাইরেক্ট কারেন্ট করে ফেলো।

অতএব একটা টেবিল ল্যাম্পের বাল্বের একদিকে BY 126-এর একদিক এবং SPST-সুইচের একদিক যোগ করলাম। ঠিক ছবির মতো বাল্বের অন্যদিকে এ. সি. কারেন্টের Nutral দিক লাগালাম। A.C. কারেন্টের Live দিকটা BY 126 ডায়োডের নেগেটিভ ও SPST-সুইচটা অফ রাখলে বাল্বটা অল্প জ্বলবে। ও SPST-সুইচের অন্যদিকে লাগালাম।

এবার মেনসুইচ অন করলাম। SPST-সুইচটা অফ রাখলে বাল্বটা অল্প জ্বলবে। ও SPST-সুইচ অন করলে আলো ভালো জ্বলবে।

হ্যাঁ, মনে রাখবে, বাল্বটা যেন কোনওক্রমেই 60 watt-এর বেশি না হয়। বেশি হলে ডায়োড জ্বলে যাবে। আর সব কানেকশনগুলোই করবে সার্কিট দেখে, সাবধানে। এদিক-ওদিক হলে বাড়ির 'ফিউজ' উড়ে যাবে।

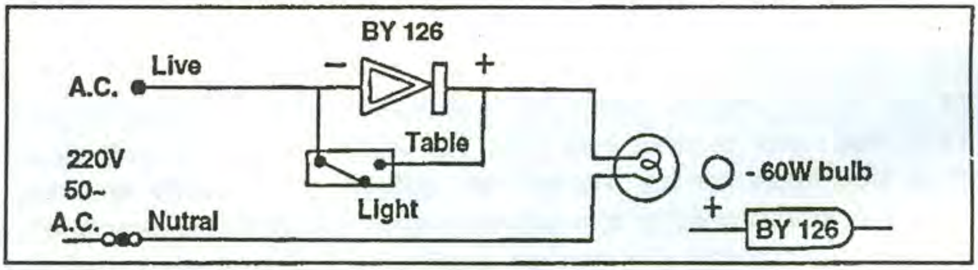

মডেল–৩৮ সৌরপাম্প

সাতসকালে পাড়া সরগরম। বুকুনের চিৎকার। স্কুলে যাবে, কলে পানি নেই। ট্যাঙ্ক ফাঁকা। লোডশেডিং-এ পানি নিচের রিজারভার থেকে ওপরে ওঠার উপায়ও নেই।

আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে ঠাণ্ডা করলাম,–ঠিকই তো, ঠিকই তো! আচ্ছা, দাঁড়া বাপু, আজই তোকে এসব কারেন্ট ছাড়া একটা মডেল বানিয়ে দিচ্ছি। নিজেই পানি তোলার বন্দোবস্ত করতে পারবি।

একনিমেষে বুকুন ঠাণ্ডা, চলে গেলে নিচের কলে চান করতে। আমিও বসে পড়লাম মডেল বানাতে। নইলে স্কুল থেকে ফিরেই তো দক্ষযজ্ঞ বাধবে।

সেই মডেলটাই দিচ্ছি তোমাদের, সেটা ওই ট্যাঙ্কে পানি ভরারই বিকল্প ব্যবস্থা। যদিও বিদ্যুতের সাহায্যে মোটর চালিয়ে ট্যাঙ্কে পানি ভরার মতো বড়সড় ব্যাপার নয়, তবে অসময়ে উপকার দেবে। বিদ্যুৎ না থাকলেও চলবে।

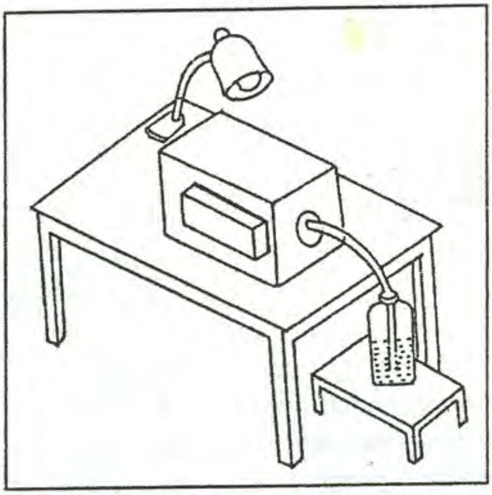

মডেল তৈরির উপকরণ

প্লাস্টিকের একটি স্বচ্ছ জার, প্লাস্টিকের সরু নল, পুডিং টিনের পাত, ভূষাকালি, অর্ধেক পানিপূর্ণ কাচের বোতল, একটা টেবিল ল্যাম্প।

মডেল সজ্জা

প্রথমেই টিনের পাতটাকে ইংরাজি ইউ (U) অক্ষরের মতো করে বাঁকিয়ে ওপরের দিকে ভূষাকালির প্রলেপ মাখিয়ে নাও। তারপর ওই বাঁকানো টিনের পাতটাকে প্লাস্টিকের জারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। জারের মুখ বন্ধ করো। এবার ওই মুখে একটা গর্ত করে প্লাস্টিকের সরু নলের কিছুটা (দুই সেন্টিমিটারের মতো) জারের মধ্যে ঢোকাও। নলের অপর প্রান্ত পানি ভর্তি বোতলের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। এখন প্লাস্টিকের জারের মধ্যে যাতে বাইরে থেকে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে, সেই জন্যে প্লাস্টিকের সরু নলের সংযোগস্থাল মোটা করে পুডিং লাগিয়ে বায়ুনিরুদ্ধ করা একান্ত দরকার।

মডেল তৈরি শেষ, এখন দেখে নাও প্লাস্টিকের জারের বাইরে থেকে, জারের ভেতরের কালো টিনের পাত দেখা যাচ্ছে কি না। কারণ টেবিল ল্যাম্পের আলো সরাসরি ওই প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়ে টিনের পাতের ওপর পড়া দরকার। এবং সেইভাবেই টেবিল ল্যাম্পটাকে জ্বেলে প্লাস্টিকের জারের কাছে রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ

টেবিল ল্যাম্প জ্বালানোর কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে, কাচের বোতলের মধ্যে আলো ডোবা অবস্থায় যে সরু নলের প্রান্ত আছে, সেই নলের মুখ থেকে বুদবুদ করে বাতাস বের হচ্ছে। অনেক্ষণ ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখলে অবশ্য বুদবুদ আস্তে-আস্তে কমতে থাকবে। এবার যদি টেবিল ল্যাম্প অফ্ করে দেওয়া হয়, তাহলে দেখতে পাবে ওই সরু নল বেয়ে পানি প্লাস্টিকের জারের মধ্যে চলে আসছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

টিনের পাতকে কালো করার কারণ, যে-কোনও কালো বস্তু আলো শোষণ করতে পারে। এবং এক্ষেত্রে ওই আলোকশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। টিনের পাতকে 'ইউ'-এর মতো করার কারণ, সমতল অবস্থার থেকে এই অবস্থায় অনেক বেশি আলো শোষণ করবে।

উত্তপ্ত বাতাস আয়তনে প্রসারিত হয়ে প্লাস্টিকের জারের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবে। পরে টেবিল ল্যাম্প সরিয়ে নেওয়ার জন্যে যখন টিনের পাত ঠাণ্ডা হবে, তখন বাতাস আবার সঙ্কুচিত হয়ে প্লাস্টিকের জারের মধ্যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি করবে। এই শূন্যস্থান পূর্ণ করতেই বোতল থেকে পানি উঠে আসবে প্লাস্টিকের জারের মধ্যে।

বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ

এতক্ষণ যে মডেল বা পরীক্ষার কথা বললাম, সেটাকেই যদি বড়সড় করে নেওয়া যায়, অর্থাৎ বৃহৎ আকারের স্বচ্ছ জার, সরু নলের পরিবর্তে মোটা পাইপ, কাচের বোতলের পরিবর্তে মাটির নিচে কোনও পানির রিজারভার, তা হলে সেক্ষেত্রে বৃহৎ জারটাকে ছাদের ওপর রাখলে, ভোরবেলা দেখবে সেটা পানিতে ভর্তি হয়ে গেছে। কারণ সারাদিন সূর্যালোকে জারের মধ্যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হবে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাত্রিবেলা পানি সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে আসবে।

এইভাবে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পানি তোলা সম্ভব।

মডেল–৩৯

ম্যাচবক্স সাইজ স্ট্রবোস্কোপ

বড়-বড় রাস্তায় তোমরা আলোর নানারকম বিজ্ঞাপন দেখেছ। তার মধ্যে নিশ্চয়ই লক্ষ করছ, কোনও-কোনও বিজ্ঞাপনে আলো খুব তাড়াতাড়ি জ্বলছে-নিভছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো। যে ইলেকট্রনিক কারিকুরির সাহায্যে এই ব্যাপারটা করা হয়, তাকে বলে স্ট্রবোস্কোপ।

এরকম স্ট্রবোস্কোপ দেখে টুকলু-বুকুনেরও সেটা বানাবার ইচ্ছে হল। তাদের বোঝালাম,–ওগুলো অনেক বড় ব্যাপার! তোমাদের একটা বরং ছোট মিনিয়েচার সার্কিট তৈরি করে দিচ্ছি।

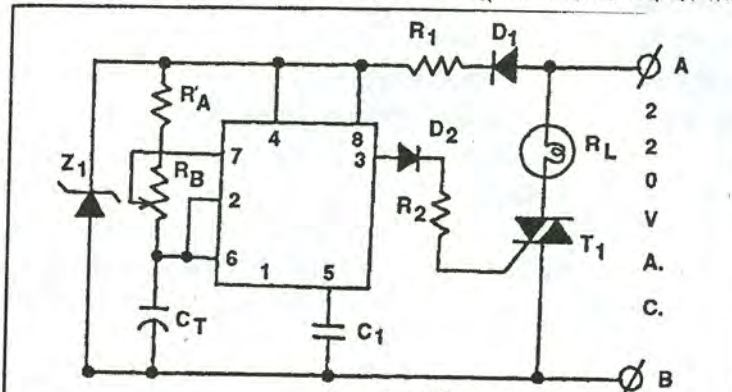

স্ট্রবোস্কোপ (সার্কিট ডায়াগ্রাম)

তোমাদেরও যে সার্কিটটা দেব, সেটা ওই স্ট্রবোস্কোপেরই মিনিয়েচার ফর্ম। বরং বলতে পারো ম্যাচবক্স সাইজ স্ট্রবোস্কোপ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, হাইস্পিড ফটোগ্রাফিতেও স্ট্রবোস্কোপ ব্যবহার করা হয়।

এবার আসি সার্কিটের কথায়। ডায়াগ্রামটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

সার্কিটে আসলে R_1, D_1 এবং Z_1দিয়ে একটি সলিড স্টেট এলিমিনেটর তৈরি করা হয়েছে এবং এর output power দিয়েই একটা low frequency square wave generator চালানো হচ্ছে, এর output দেওয়া হচ্ছে triac-এর gate পয়েন্টে। ফলে (R_L) লোহাটি জ্বলা-নেভা করে।

সার্কিটের frequency পরিবর্তন করতে গেলে R_B-এর মান পরিবর্তন করতে হবে। square wave generate-করার জন্য $R_A << R_B$ নিতে হবে, ফলে সার্কিটের frequency হবে \f(7,R_BC_T)। সার্কিটে power-এর ক্ষেত্রে A পয়েন্টে live line এবং B-তে (–) দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

R_1 — 10k, 10w

D_1—By127

R_A, RB — (see text);

C_1—(see text);

Z_1—9V. 1W.;

C_1 — 01mF;

D_2—IN4001;

R_2—470W;

T_1—Triac.

মডেল-৪০ কলিংবেলে গানের সুর

এবারের যে নতুন কলিংবেলের কথা বলছি, সেটা যেমন মজার, বানানোও তেমনি সোজা। যে বিশেষ I.C. টা এখানে ব্যবহার করতে হবে তার মধ্যে ভরা রয়েছে আটটা স্বল্প দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন গানের সুর। কেউ একবার মাত্র কলিংবেলের সুইচটা টিপলেই একটা গানের সুর বাজাতে শুরু করবে; এবং থামবে সেই সুরটা শেষ হলে। পরের বার আবার কেউ কলিংবেলের সুইচ টিপলে তার পরের গানটা বাজতে শুরু করবে। এমনিভাবেই চলবে।

আবার, এই কলিংবেলটা কাজ করে মাত্র দেড় ভোল্টের দুটো ব্যাটারিতে; সুতরাং লোডশেডিং-এর সময়ও কোনও অসুবিধে নেই।

এবার দেখা যাক, কী-কী লাগবে এটা বানাতে।

(১) I.C. 4822 অথবা IC 4820—একটা (বেস সমেত)
(২) SL 100 বা TL 100 ট্রানজিস্টর—থডর্নত
(৩) 68Pf ক্যাপাসিটর—একটা
(৪) 82KΩ রেজিস্টর—একটা
(৫) স্পিকার—একটা
(৬) ব্যাটারি (1.5 ভোল্টের)—দুটো
(৭) ছোট ভেরো বোর্ড–একটা

এবার শুরু করার পালা।

প্রথমেই ভেরো বোর্ডটার ওপর IC বেসটাকে বসিয়ে নিতে হবে। ছবি অনুযায়ী 82KΩ আর 68Pf-কে লাগাতে হবে ঠিক জায়গামতো। SL 100 ট্রানসিস্টর, বেস, এমিটরী কালেক্টর।

চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।

ছবি অনুযায়ী সবগুলো সংযোগ ঠিকমতো হওয়ার পর IC বেসে IC টা বসিয়ে কেবলমাত্র ব্যাটারি সংযোগের অপেক্ষা।

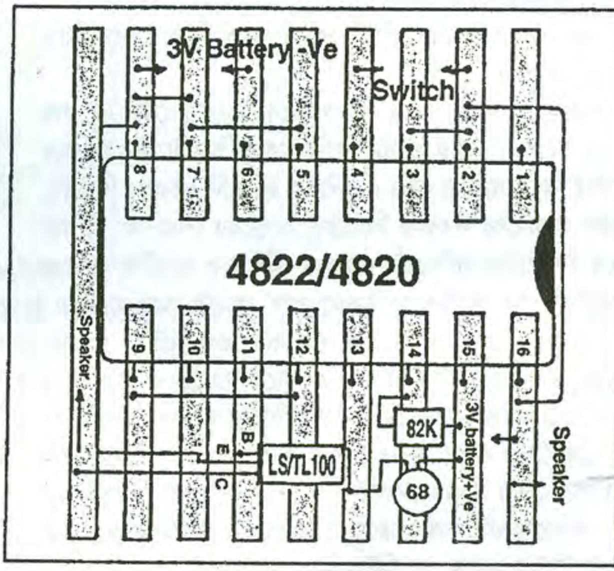

মডেল-৪১

মশা তাড়াবার যন্ত্র

টুকলু এসেই বলতে শুরু করল,–মশার প্রকোপ দিন-দিন যেন বেড়েই চলেছে। আর এই সুযোগে একদল ব্যবসায়ী চুটিয়ে ব্যবসা করে নিচ্ছে–মশা তাড়াবার যন্ত্র বিক্রি করে। সামনে পরীক্ষা। মশারির ভেতরে আর কত পড়া যায়? মামা একটা উপায় বার করো।

–ঠিক বলেছিস। 'গুড নাইট', 'স্লিপ ওয়েল' ইত্যাদি বাজারে বিক্রি হয় প্রায় একশো টাকা দামে। অথচ ওগুলো তৈরি করতে খরচ পড়ে সামান্য কিছু টাকা। তাছাড়া আমাদের দেশীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে আরও অনেক সহজে এবং মাত্র আট-দশ টাকায় সুন্দর মশা তাড়াবার যন্ত্র তৈরি করা যায়। তোরা দুজনে মিলে একটা যন্ত্র বানিয়ে নে। খরচ কম পড়বে অনেক।

লাফিয়ে উঠল টুকলু–বাঃ ফাইন। চটপট বলে যাও। আমি জোগাড় করে ফেলি।

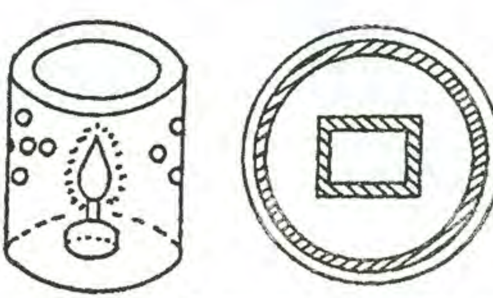

আমি বলতে শুরু করি, সবটাই বলে দিচ্ছি। শুনে নিয়ে বানিয়ে ফেল।

একটা কৌটো নিয়ে এসো। বেবিফুডের কৌটোই সব থেকে ভালো। এবার একটা স্পিরিটের কুপি কৌটোর ভেতরে ঝালাই করে বসিয়ে দাও। কুপিতে জ্বালানি থাকবে স্পিরিট, কারণ আমাদের দরকার নিয়ন্ত্রিত আগুনের শিখা–যা পাওয়া যাবে স্পিরিটের কুপিতেই। এবার কৌটোর ঢাকনির মাঝখানে এক বর্গ ইঞ্চি কেটে বাদ দিয়ে, সেই জায়গায় একটা অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিল বা দস্তার পাত ঝালাই করে লাগিয়ে দিতে হবে। ব্যস, যন্ত্র তৈরি হয়ে গেল।

এবার বাজার থেকে এক প্যাকেট 'গুড নাইট' বা ওই জাতীয় প্যাড কিনে আনতে হবে। অথবা ফেলে দেওয়া প্যাডগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে 'সেট্রিনল' তেলে ভিজিয়ে। বাজারে অথবা সরকারি বিপণন কেন্দ্রে 'সেট্রিনল তেল' সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মাপের পাত্রের পাওয়া যায়, যার দাম তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকার ভেতর।

কৌটোর ওপর দিকে ধাতব পাতের ওপর একটা প্যাড রেখে নিচের কুপিটি জ্বালিয়ে কৌটোটাকে যে-কোনও জায়গায় রেখে দাও। দেখবে মশা আর ধারে-কাছে ঘেঁষছে না।

আসলে ওই সব বাজারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলোও একই নীতিতে কাজ করে। শুধু স্পিরিট-কুপির জায়গায় ছোট একটা হিটার থাকে, যা হিটারটির ওপরে রাখা ধাতব পাতকে উত্তপ্ত করে। ফলে মশা একেবারে সাফ!

আর হ্যাঁ, এখানে কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার। এক, কৌটোর গায়ে বেশ কিছু ফুটো রাখা আবশ্যক–অক্সিজেন চলাচলের জন্য। দুই, কৌটোর ঢাকনিতে যে পাতটা লাগানো হয়েছে-নজর রাখতে হবে যে, কুপির শিখাটি যেন ঠিক তার নিচে হয়। তিন, শিখার শীর্ষ বিন্দু থেকে ঢাকনির দূরত্ব, দুই ইঞ্চির মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং চার, একটি প্যাড আট-দশ ঘন্টা চলবার পর পুনরায় তেলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

যন্ত্রটার খরচ পড়বে মাত্র দশ টাকার মতো।

তেলের খরচ অবশ্য আলাদা।

এবার বানিয়ে ফ্যাল। আর যন্ত্রটা কেমন কাজ করছে অবশ্যই জানাবি কিন্তু।

মডেল–৪২ পাতা থেকে বিদ্যুৎ

আলোচনা হচ্ছিল পরিবেশ দূষণ নিয়ে। বুকুন খুব বিজ্ঞের মতো বলল,–পরিবেশ ঠিক রাখতে সবুজ গাছের খুব দরকার। কিন্তু গাছ না কাটলে জ্বালানি তো পাওয়া যাবে না।

–তা ঠিক। তবে–

–তবে কী কাকু?

জ্বালানি ছাড়াও গাছের অন্য বিরাট ভূমিকা রয়েছে। –আমি বলি ঃ সত্যি কথা বলতে, সেগুলোর গুরুত্ব অনেক-অনেক বেশি। যেমন, এখন যে এক্সপেরিমেন্টটা তোদের বলছি, সেটাতেও গাছেরই বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকলে যে অসুবিধায় পড়ি, এই মডেল সেই অসুবিধা অনেকটাই মিটিয়ে দেবে।

বুকুনের চোখ খুশিতে চকচক করে উঠল। উৎসাহী হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই তোমরাও।

সুতরাং এবার সবাই মিলে লেগে পড়া যাক, কেমন!

এক্সপেরিমেন্টটা করার আগে দেখে নাও তোমাদের এলাকায় কত রকমের গাছ আছে। বিভিন্নরকম গাছের সংখ্যা যত বেশি হবে, এক্সপেরিমেন্টও তত ভালো হবে।

এক্সপেরিমেন্টের জন্য প্রথমেই তোমাদের কতকগুলো ধাতুর পাত জোগাড় করে নিতে হবে। এই ধাতুর পাতগুলোর যদি কোনও একটা জোড় বাড়িতে পেয়ে যাও, তাহলে কোনওরকম খরচ ছাড়াই এক্সপেরিমেন্টটা হয়ে যাবে।

প্রয়োজনীয় ধাতু জোড়গুলোর তালিকা ঃ

(i) পিতল – অ্যালুমিনিয়াম

(ii) তামা – অ্যালুমিনিয়াম

(iii) রুপো – অ্যালুমিনিয়াম

(iv) পিতল – জিঙ্ক

(v) তামা – জিঙ্ক

(vi) রুপো – জিঙ্ক

যে-কোনও একটি ধাতু জোড়ার কিছুটা ২ সেমি; ২ সেমি করে পাত জোগাড় হয়ে গেলে, পাতগুলোকে বা এর কাছাকাছি কোনও মাপের বর্গাকার আকৃতিতে টুকরো করে নাও। এক্ষেত্রে মনে রাখবে, এই বর্গাকার মাপের উপর কোষের বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রা নির্ভর করবে। সেই সঙ্গে ধাতুর পাতগুলো পাতলা হবে তত দামেও কম হবে, এবং টুকরো করতেও সুবিধা হবে।

এবার বাড়ির ধারের যে কোনও গাছ থেকে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে আনো। একটা কাঠি দিয়ে পাতার দু-পিঠেই আস্তে-আস্তে আঁচড় কেটে দিতে হবে। আঁচড় কাটার সময় মনে রাখতে হবে পাতা যেন ছিঁড়ে না যায়, এবং এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় না হয়ে যায়।

যে ধাতুর জোড়া নিয়ে পরীক্ষা করছ, সেই ধাতু জোড়ের দু-টুকরো নিয়ে দুদিকে দুটো রেখে সুতো দিয়ে বেঁধে দাও। অর্থাৎ যারা তামা-দস্তা জোড়া নিয়ে পরীক্ষা করছ, তারা পাতার একদিকে তামা আর একদিকে দস্তা দিয়ে পাত

দুটো আটকে নাও। পাত দুটো আটকানোর সময় মনে রাখতে হবে, কোনও অবস্থাতেই যেন পাতদুটো সরাসরি না ঠেকে যায়।

এবার দুটো পাত থেকে দুটো তার ঝালাই করে নাও। এমনি অন্তত পঞ্চাশটা কোষ তৈরি করো, এবং প্রয়োজন মতো যোগ করে নাও।

তোমাদের তৈরি এই সেলগুলো দিয়ে তোমরা L.C.D. ক্যালকুলেটর, L.C.D. ঘড়ি, পকেট ভিডিও গেমস চালাতে পারো।

জোড়	বিভব প্রভেদ V.	প্রবাহ মাত্রা *u*A.
পিতল–অ্যালুমিনিয়াম	0.5	320
তামা–অ্যালুমিনিয়াম	0.5	130
রুপো–অ্যালুমিনিয়াম	0.5	330
পিতল–দস্তা	0.8	700
তামা–দস্তা	0.8	750
রুপো–দস্তা	0.8	850

মডেল–৪৩

বহনযোগ্য সৌরচুল্লি

জ্বালানির ভান্ডার যেভাবে দ্রুত শেষ হয়ে আসছে তাতে পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। আর সেজন্যেই সূর্যের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে আমাদের। পৃথিবীর সব দেশেই সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরচুল্লি তৈরির হিড়িক পড়ে গেছে।

ঠিক এমনসময়ে মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ-এর খুদে সদস্যরা এসে জানাল–ওরা এরকমই এক ছোট আকারের সৌরচুল্লি বানিয়েছে। এই চুল্লিকে বয়েও নিয়ে যাওয়া যাবে এখানে-ওখানে। এতে পানি গরমও হবে খুব সুন্দরভাবে।

কী-কী লাগবে ঃ (১) কাঠের বাক্স (২) টিনের বাক্স, (৩) তামার নল, (৪) ওয়াটার ট্যাপ, (৫) কাচের পাত, (৬) কাঠের গুঁড়ো (৭) রবার নল, (৮) ক্লিপ, (৯) পানির পাত্র, (১০) থার্মোকল, (১১) কাঠের টুকরো, (১২) পেরেক, (১৩) ফেভিকল, (১৪) পুডিং।

তৈরি করার পদ্ধতি ঃ একটি কাঠের বাক্স নিতে হবে যার দৈর্ঘ্য ২৪", প্রস্থ ১২"। দৈর্ঘ্য বরাবর একদিকের উচ্চতা হবে ১২" অন্যদিকে ৩"। এখন এই দুই পার্শ্বতলের উচ্চতা দুরকম হওয়ার দরুণ উপরের খোলা তলটা ঢালু হবে (১নং 'ক' চিত্রানুযায়ী)। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে ঢালু বা নততলের উন্নতিকোণ যেন ৪৫০ বা তার কম হয়। এবার একটি টিনের বাক্স নিতে হবে যায় গঠনটা হবে কাঠের বাক্সের মতোই কিন্তু আকারে ছোট হবে। টিনের বাক্সের দৈর্ঘ্য হবে (24-2× 2.3)" বা 21", প্রস্থ (12-2×\ 3.2)" বা 9" এবং একদিকের উচ্চতা হবে (12-2× 3.2)" বা 11ভাগের 1.2 " এবং অপরদিকের (3 ভাগের 1.2)" এবং অপরদিকের (3 ভাগের 1.2)" এবং অপরদিকের (3 ভাগের 1.2)" এবং অপরদিকের (3 ভাগের 1.2)" বা 2 ভাগের 1.2"। টিনের বাক্সের ভিতরের দিকটাকে কালো রং করে দিতে হবে। এখন কাঠের বাক্সের মধ্যে টিনের বাক্সটাকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে দুটো বাক্সের মধ্যে একটুখানি ফাঁকা জায়গা থাকে। এই ফাঁকা জায়গাটাতে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে (২নং ছবিতে দেখানো হয়েছে)।

এখন 1.2" ব্যাসের তামার নল দিয়ে '3' নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে একটা জাফরি তৈরি করতে হবে। দুটো 24" লম্বা নলের একপ্রান্ত থেকে 21"-এর মধ্যে 6টি করে ছিদ্র করে ৬টি ৬" লম্বা নল ঝালাই করে জুড়তে হবে (ছবির মতো)। সম্পূর্ণ জায়গাটিকে কালো রং করে আগেই তৈরি করা বাক্সের মধ্যে ঢালুতলের সমান্তরাল করে এমনভাবে বসাতে

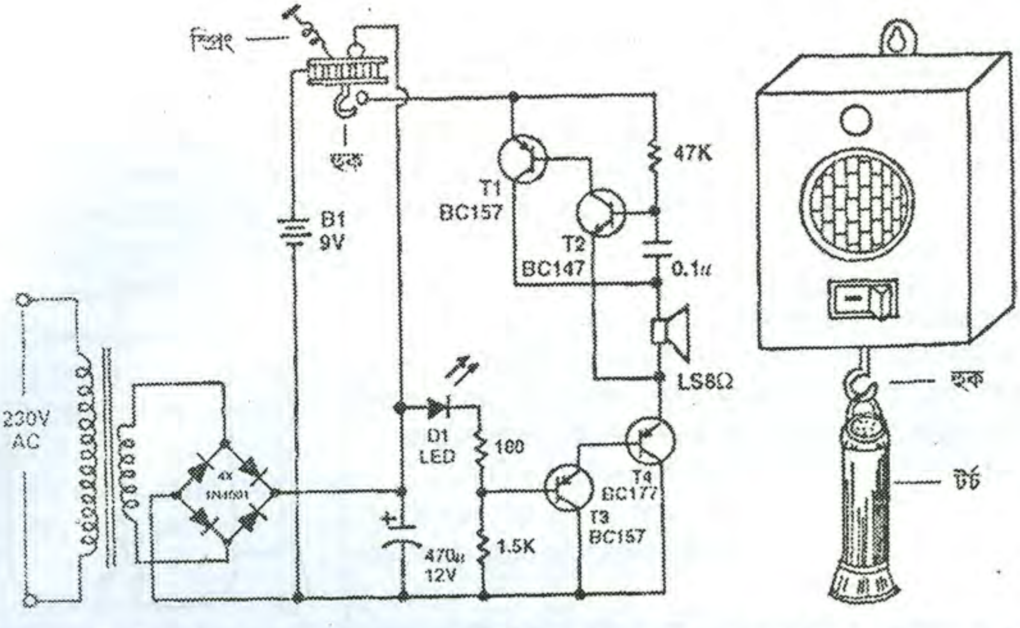

হবে যাতে বাক্সের বিপরীত দুই দেওয়ালের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পানির প্রবেশ পথ 'A' ও নির্গম পথ 'B' বাক্সের বাইরে থাকে (ছবি–১ (ক))। এখন খোলা ঢালুতলের ওই তলেরই মাপমতো (প্রায় 22" × 14") একটি কাঁচের পাত বসিয়ে তার ধার বরাবর 1.2" কাঠের লম্বা টুকরো রেখে আবার ওই একই আকারের আর-একটা কাচের পাত বসাতে হবে। অর্থাৎ ওই দুটো কাচের পাতের মধ্যে 1.2" পুরু বাতাসের স্তর বা air gap রাখতে হবে। এবারে সমস্ত বাক্সটাকে ফেভিকল দিয়ে এঁটে ভালোভাবে পুডিং লাগিয়ে দিতে হবে যাতে একটুও বাতাস না ঢোকে অর্থাৎ air-tight করতে হবে।

এবারে আসা যাক যে পাত্রটিতে ঠাণ্ডা পানি নেওয়া হবে সেই ট্যাঙ্কের কথায়। নিচের দিকে সরু নল লাগানো টিনের বা যে-কোনও পানির পাত্র নিতে হবে। নলটা পানির নির্গম পথ (outlet) হিসেবে কাজ করবে। এই পাত্রটাকে থার্মোকল দিয়ে মুড়ে দিতে হবে (১ নং 'খ' ছবির মতো)। একটি রবার নলের সাহায্যে পানির ট্যাঙ্ক ও হিটারের মুখ জুড়ে দিতে হবে। রবারের নলে ক্লিপ লাগিয়ে দিলে পানির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধে হয়। এখানে ওয়াটার ট্যাপও ব্যবহার করা যেতে পারে। পানির ট্যাঙ্ককে হিটারের থেকে উঁচুতে রাখতে হবে।

ব্যবহারের পদ্ধতি ঃ

পানির ট্যাঙ্কে পানি (ঘরের তাপমাত্রার) নিলে। এবারে রবার নলের ক্লিপ খুললেই জল তামার নলে এসে ঢুকবে। ওয়াটার হিটারটাকে সূর্যের আলোয় এমনভাবে রাখতে হবে যাতে নিচু দেওয়ালটা দক্ষিণ দিকে থাকে। মিনিট কয়েক পর (পরিষদের হিসেব অনুযায়ী–জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের 11.00-12.00 A.M. সময়ে, 5-6 মিনিট পর) নির্গম নলের ট্যাপ খুললে গরম পানি (40°c-45°c) পাওয়া যায়। এই পানি চা, কফি, হরলিকস বা অন্যান্য খাবার তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারো। এ ছাড়াও শীতকালে স্নানের পানি, বিশুদ্ধ খাবার পানি হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো।

মডেল–৪৪

সিলভার ডল

বুকুনের গ্রিটিংস কার্ড পেয়ে তার উপর টুকলু যেমন খুশি, আমার উপর তেমনই মহাখাপ্পা। আমি নাকি তাকে তেমন ভালোবাসি না, যেমনটি বুকুনকে। এরমধ্যে সে তার মামাবাড়ি এসেছে কয়েকবারই, কিন্তু অভিমানে আমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে গেছে। আমারও কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ সেদিন শুকনো মুখে এসে হাজির শ্রীমান টুকলু। মুখ দেখে বুঝলাম রাগ এখনও গলেনি।

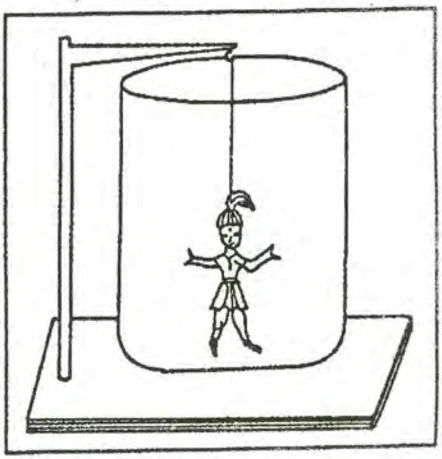

বললাম, এসো, ভাগ্নেবাবু এসো। কেমন আছ,

যাও আর অত আদর দেখিও না। আমি এলে তো তুমি বিরক্ত হও।

সে কী? এসব বাজে কথা! বলো-বলো তোমার কী চাই?

মাথা নিচু করে টুকলু আস্তে-আস্তে বলল,–কাল বন্ধুর বোনের জন্মদিন। চমকে দেওয়ার মতো কী উপহার দেওয়া যায় বলো তো?

সিলভার ডল–মানের রুপোর একটা পুতুল উপহার দাও।

ধ্যুৎ-ধ্যুৎ! ওটা একটা চমকানোর মতো উপহার হল! আর রুপোর পুতুলের দামও অনেক। মামা, তুমি আজকাল কেমন বোকা-বোকা হয়ে যাচ্ছ।

না হে ভাগনে, এ পুতুল রুপোর নয়। আর দামেও অনেক সস্তা। নিজেই বানিয়ে নেবে।

আগে কী-কী লাগবে দেখো ঃ কাচের দন্ড, একটা বড় কাচের পাত্র, বড় আকারের তামার পাত একটা। দু-তিন গ্রাম সিলভার নাইট্রেট এবং কিছুটা পাতিত বা পরিস্রত পানি। নাইলন সুতো।

কী করবে ঃ তামার পাতটা কাঁচি দিয়ে কেটে পুতুলের মতো আকৃতি দাও। বড় কাচের পাত্রে বইরে থেকে কোনও কিছুর সাহায্যে নাইলন সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দাও।

এবার পাত্রে আধলিটার মতো পরিস্রত পানি দাও। সিলভার নাইট্রেট মেশাও। দন্ড দিয়ে গুলে ফেলো। দ্রবণে পুতুলটি রাখার কিছুক্ষণ পরে দেখবে সেটা রুপোর মতো দেখাচ্ছে।

কেন এমন হয়? সেটা বলছি। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের সংস্পর্শে তামা দ্বারা বিজারিত হয়ে রুপো বা সিলভারে পরিণত হয়ে তামার পুতুলের উপর জমা হয়ে রুপোর পুতুল বা সিলভার ডল তৈরি হচ্ছে। তামা পরিণত হয় কিউপ্রিক নাইট্রেট লবনে। তাই লাগছে যেন রুপো।

কেমন, দারুণ না?

18	16 এবং 31
19	17
20	32
21	30
22	19
23	18
24	21
25	22
26	28
27	27
28	26
49	12
38	23

এবার 1 নম্বর বোর্ডের কয়েকটি পাতকে সরাসরি ৫ নম্বর বোর্ডের সুইচগুলো সঙ্গে যোগ করা দরকার।

5 নং বোর্ডে আছে ৫টা টেপা সুইচ। প্রত্যেকটা সুইচের একটা করে পয়েন্ট তার দিয়ে যোগ করা আছে। প্রথম সুইচের খালি পড়ে থাকা পয়েন্টটা সরাসরি সংযোগ করো 1 নম্বর বোর্ডের 44 নম্বর পাতে। এমনিভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সুইচের খালি পড়ে থাকা পয়েন্টগুলো যথাক্রমে প্রথম বোর্ডের 43, 42, 41 এবং 36 নম্বর পাতে সরাসরি সংযোগ করো। সুইচের যে প্রান্তগুলো একটা তার দিয়ে যোগ করা আছে (5 নম্বর বোর্ডের ছবি দেখো), তার যে-কোনও একটা প্রান্তকে 1 নম্বর বোর্ডের 38 নম্বর পাতের সঙ্গে যোগ করো।

এবার বাকি–অ্যালার্মের অংশটুকু জুড়ে দেওয়া।	
অ্যালার্ম বোর্ডের বিভিন্ন পাতের নম্বর	1 নম্বর বোর্ডের বিভিন্ন পাতের নম্বর
1	35
7	4
4	53

অ্যালার্ম বোর্ডে এবার একটা স্পিকারও লাগানো দরকার। স্পিকারের দুটো তার অ্যালার্ম বোর্ডের ৪ আর ১২ নম্বর পাত দুটোতে ঝালাই করো।

কাজ তো শেষ। এবার আই. সি. গুলো ঠিকমতো জায়গায় আই. সি. বেসের ওপর লাগানো বাকি। ১ নম্বর বোর্ডে প্রথমেই MM 5369 I. C. টা লাগিয়ে নাও। তারপর লাগাও MM 5402। এটা চল্লিশ পিনের আই. সি.; সুতরাং সাবধানে লাগিও এবং চেষ্টা করো এর পিনে যত কম হাত লাগে। IC 555 বসবে অ্যালার্ম বোর্ডে; সবসময়ই আই. সি. বসানোর আগে তার খাঁজ কাটা দিকটা দেখে নিয়ে বসাবে; উলটো যেন না বসে।

এবার ট্রান্সফরমারের প্রাইমারিকে বাড়ির এ. সি. লাইনের কোনও প্লাগে সংযুক্ত করো।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়ির ডিসপ্লে বোর্ডের সেভেন সেগমেন্ট LED ডিসপ্লে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং জ্বলতে-নিভতে থাকবে। কন্ট্রোল বোর্ডের প্রথম বা দ্বিতীয় সুইচ টিপলেই জ্বলা-নেভা বন্ধ হয়ে স্থিরভাবে জ্বলতে থাকবে।

'দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সুইচ' টিপলে ঘড়িতে সময়ের দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকবে। 'ধীরে এগিয়ে যাওয়ার সুইচ' টিপলে ঘড়িতে আস্তে-আস্তে সময়ের পরিবর্তন হবে। 'সেকেন্ডের সুইচ' টিপলে ঘড়ি সময় দেখানো বন্ধ করে সেকেন্ড দেখাবে।

ঘড়িতে যদি অ্যালার্ম দিতে চাও তাহলে একহাতে 'অ্যালার্মের সুইচ' চেপে ধরে অন্য হাতে 1 বা 2 নম্বর সুইচের সাহায্যে অ্যালার্ম বাজার সময়টা ঠিক করতে হবে। আর অ্যালার্ম যখন বাজতে শুরু করবে সে বেজেই চলবে প্রায় এক

মিনিট ধরে, তাই তাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য রয়েছে 5 নম্বর বোর্ডে যে 30pf ট্রিমার ক্যাপাসিটরটা রয়েছে সেটা একটু ঘুরিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।

এই ঘড়ি একটা অসুবিধে হল, লোডশেডিং-এর সময় ঘড়ি তার চলা বন্ধ করে বসে থাকে; সুতরাং বিদ্যুৎ ফেরত আসার পর আবার ঘড়ির সময় ঠিক করতে হয়। এটা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। এই ঝামেলা এড়ানোর জন্য একটা ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একটা 9 ভোল্টের ব্যাটারির প্রয়োজন হবে। 29 নম্বর পাতে পজিটিভ প্রান্ত আর নেগেটিভ প্রান্তটা 38 নম্বর পাতে সংযোগ করতে হবে। এবার লোডশেডিং-এর সময়ও ঘড়িটা চালু থাকবে, যদিও সময় দেখা যাবে না। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ ফিরে এলেই ঘড়ি আপনা থেকেই সঠিক সময় দেখাতে থাকবে।

ঘড়িতে তিনটে LED লাগানো হয়েছে। রাত 12টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত AM চিহ্নিত LEDটা জ্বলবে এবং দুপুর 12টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত PM চিহ্নিত LEDটা জ্বলবে।

একটা সেকেন্ড ডিসপ্লে LED-ও লাগানো হয়েছে। এটা সারাদিনই জ্বলবে-নিভবে।

MM 5369 ICটা যে চারটে পাতকে অধিকার করে রয়েছে তাদের মাঝখানটা কেটে-কেটে আলাদা করে দেওয়া হয়নি। ওই চারটে পাতকে মাঝখান থেকে কেটে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

মডেল–২৮

ইলেকট্রিক মোটর

স্কুলেতে ইলেকট্রিক মোটর পড়ানো হচ্ছিল।

অনেকদিন থেকেই বুকুনের ইচ্ছে ছিল ও একটা এরকম মোটর বানাবে; এবার স্কুলে সেই বিষয়টাই পড়ানো শুরু হতেই বুকুনের ইচ্ছেটা জোরদার হয়ে উঠল।

আমার কাছে ওর ইচ্ছেটা প্রকাশ পেতেই বললাম,–ইলেকট্রিক মোটর তো খুব সোজা ব্যাপার; আর তোদের ক্লাসে যখন ওইটাই পড়ানো হচ্ছে তুই-ই একটা প্ল্যান কর না যে কীভাবে মোটরটা বানানো যায়।

প্ল্যান একটা ও করেছিল ঠিকই; কিন্তু তার মধ্যে যেসব জিনিসের নাম ছিল, সেগুলো হাতের কাছে পেলে বোধহয় একটা সিলিং ফ্যান চালানোর উপযুক্ত মোটর তৈরি করা যেতে পারত।

সুতরাং সে প্ল্যান বাতিল করে নতুনভাবে ভাবতে হল। এবার খুব সহজে হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন কতকগুলো জিনিস হলেই একটা ইলেকট্রিক মোটরের ছোট মডেল তৈরি করে ফেলা যাবে।

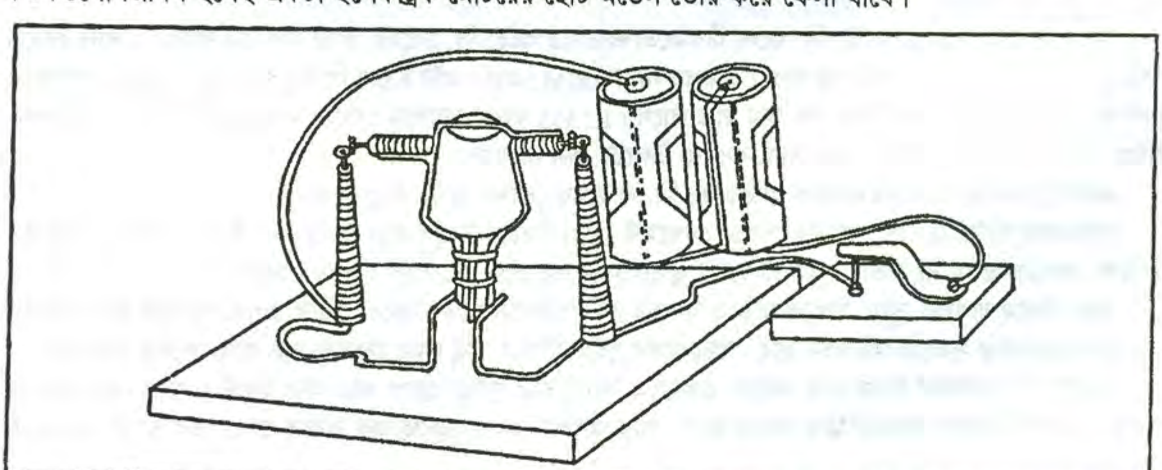

যা-যা লাগবে সেগুলো হল ঃ

(১) কর্ক (শিশি-বোতলের ছিপি)–একটা

(২) ৮০ নম্বর বেল-তার

(৩) 6 ইঞ্চি চওড়া, 12 ইঞ্চি লম্বা, 1 ইঞ্চি মোটা কাঠের পাটাতন-একটা

(৪) লম্বা, ফাঁপা কাঁচনল-একটা

(৫) 4 ভাগের 1.2 ইঞ্চি লম্বা পেরেক–একটা

(৬) 3 ভাগের 1.2 ইঞ্চি লম্বা পেরেক-তিনটে

(৭) ব্যাটারি (1.5 ভোল্ট)–দুটো

(৮) টেপা সুইচ–একটা

প্রথমেই কাচ নলের এক প্রান্তটা স্টোভের আগুনে গলিয়ে মুগুরের মতো করে ফেলা হল। এবার ওই প্রান্তটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হল কর্কের মধ্যে। একটি 3 ভাগের 1.2 ইঞ্চি পেরেক কর্কের অপর প্রান্তে একইভাবে জড়ানো হল। তারের দুই প্রান্তকে নামিয়ে আনা হল কাচ নলের গায়ে। তারের প্রান্ত দুটোকে কাচ নলের সঙ্গে সুতো দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হল।

ওই পেরেকটারই এক প্রান্ত থেকে বেল-তার (Bell-wire) জড়ানো শুরু হল ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, সেইদিকে। তারপর ওই তারকেই টেনে নিয়ে গিয়ে পেরেকের অপর প্রান্তে একইভাবে জড়ানো হল। তারের দুই প্রান্তকে নামিয়ে আনা হল কাচ নলের গায়ে। তারের প্রান্ত দুটোকে কাচ নলের সঙ্গে সুতো দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হল।

এতক্ষণে যে জিনিসটা তৈরি হল তার নাম–আর্মেচার। 4 ভাগের 1.2 ইঞ্চি লম্বা পেরেকটা কাঠের পাটতনের এক পাশ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এবার আর্মেচারের নলটাকে বসিয়ে দেওয়া হল ওই পেরেকের ওপর। আর্মেচারটাকে এবার একটু ঘুরিয়ে দেখে নিতে হবে যে সেটা খুব সহজে ঘুরছে কি না!

এবার ফিল্ড কয়েল তৈরির পালা। তার জন্য ওই 3 ভাগের 1.2 ইঞ্চি লম্বা পেরেকটা কাঠের পাটাতনের একপাশ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এবার আর্মেচারের নলটাকে বসিয়ে দেওয়া হল ওই পেরেকের ওপর। আর্মেচারটাকে এবার একটু ঘুরিয়ে দেখে নিতে হবে যে সেটা খুব সহজে ঘুরছে কি না!

এবার ফিল্ড কয়েল তৈরির পালা। তার জন্য ওই ৩ ভাগের ১.২ ইঞ্চি লম্বা পেরেক দুটোকে এমনভাবে কাঠের পাটাতনের ওপর বসাতে হবে যাতে তারা আর্মেচারের দুপাশে তাকে না ছুঁয়ে অথচ খুব কাছাকাছি থাকে (ছবি দেখো)। পেরেক দুটোতেও ওই বেলতার জড়াতে হবে; আলাদা-আলাদাভাবে এবং ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার উলটো দিকে।

ডানদিকের কয়েলের একটা প্রান্ত ব্যাটারির পজিটিভে যুক্ত হবে এবং অপর প্রান্তটা আর্মেচারকে স্পর্শ করবে।

বাঁ-দিকের কয়েলের একটা প্রান্ত প্রথমে টেপা সুইচের এক প্রান্তে আসবে; সুইচের অপর প্রান্তটি ব্যাটারির নেগেটিভে সংযুক্ত হবে।

কাজ শেষ। এবার কেবল সুইচ টেপার অপেক্ষা।

এ মডেলটা তৈরির সময় যে কয়েলের তার যেভাবে জড়াতে বলা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই জড়াতে হবে; নইলে কোনও কাজই হবে না।

মডেল–২৯ আগুন নেভানোর যন্ত্র

বাড়িতে একটা আগুন নেভানোর যন্ত্র থাকলে কেমন হয়?–বুকুনের প্রশ্ন। বললাম,–মন্দ না। তবে ওইরকম যন্ত্রগুলোর দামও কিন্তু কম নয়।

–আরে না-না, আমি কি কেনার কথা বলছি? বলছিলাম একটা ওই যন্ত্র তৈরি করলে কেমন হয়? জানো তো, সেদিন কেমিস্ট্রি ক্লাসে ম্যাডাম বলছিলেন যে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে নাকি আগুন সহজেই নিভে যায়।

–সে তো আমিও জানি।

শুধু ওইটুকু জানলেই তো হবে না।–বুকুনের ভাবখানা বেশ বিজ্ঞের মতো। জানতে হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় কীভাবে।

কীভাবে?–আমি প্রশ্ন করি।

–সোডার দ্রবণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে।

–তবে আর কী! ঘরে সালফিউরিক অ্যাসিড আর সোডার দ্রবণ রেখে দে; প্রয়োজন হলেই মেশাবি আর আগুনের কাছে ধরবি।

হাত নেড়ে বুকুন বলে,–তা কেন? আমি একটা দারুণ মতলব ভেঁজে রেখেছি। শোনোই না!

বুকুনের মতলব অনুযায়ী আমাদের প্রয়োজন ঃ

(১) ধাতুর তৈরি একটা পাত্র (কনিক্যাল ফ্লাস্কের মতো দেখতে)

(২) পাত্রটার সমান উঁচু একটা কাচ নল; মোটা ও ফাঁপা

(৩) ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা রবারের নল ও একটা জেট (অর্থাৎ কাচের ছুঁচল মুখ। এটা কাচের ড্রপারের মুখটার মতো দেখতে। ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে নিতে হবে। কিংবা বাড়িতেও স্টোভের আগুনে কাচের টিউব গরম করে টেনে বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে।)

(৪) পাত্রের মুখের মাপের একটি রবার কর্ক

(৫) সালফিউরিক অ্যাসিড

(৬) কাপড় কাচা সোডার দ্রবণ

প্রথমেই কাচের নলটার একটা দিক স্টোভের বা বার্নারের আগুনে গরম করে সেদিকটা বন্ধ করে তাতে খানিকটা সীসার ভার পুরে দিতে হবে।

তারপর নলের মাঝখানটাকে গরম করে আস্তে-আস্তে খোলা দিকটা দিয়ে সাবধানে ফুঁ দিলে মাঝখানটা ফুলে উঠবে। এই ফোলানো অংশের নিচের দিকটা বন্ধ করে তার মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে দিতে হবে। এ কাজটা বেশ সাবধানেই করতে হবে।

এবার পাত্রটার মধ্যে সোডার দ্রবণ গলা পর্যন্ত ঢেলে দিতে হবে। রবার কর্কের মধ্যে ফুটো করে তার মধ্যে দিয়ে ছবি অনুযায়ী কাচ নল ঢুকিয়ে বাইরের অংশের সঙ্গে রবারের নলের সাহায্যে জেটটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। সীসের ভার তলায় থাকায় কাচ নলটি দ্রবণের ভিতর সোজা হয়েই থাকবে।

কোনও জায়গায় আগুন লাগামাত্রই পাত্রটাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কাত করলেই নলের ফোলানো অংশটা ফেটে গিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশবে সোডার দ্রবণে; সঙ্গে-সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডও দ্রুত উৎপন্ন হবে এবং তীব্রগতিতে বেরিয়ে আসবে জেটের মুখ দিয়ে। রবারের নল লাগানোর ফলে জেটের মুখ যেদিকে ইচ্ছে বাঁকানোও যাবে।

মডেল-৩০

নতুন কলিংবেল

এই বইয়েরই তোমরা একটা কলিংবেল তৈরি শিখেছিলে। এবারে তিনটে আই. সি. ব্যবহার করে আর-একটা নতুন ধরনের কলিংবেল তৈরির কথা তোমাদের বলতে পারি। এর আওয়াজ আরও মধুর।

এটার জন্যে যা-যা কিনতে হবে সেই লিস্টটার দিকে তাকাও।

(১) I.C. 555-দুটো (আই. সি. বেস সহ)
(২) I.C. 7493—একটা (আই. সি. বেস সহ)
(৩) স্পিকার (8 W)—একটা
(৪) ক্যাপাসিটর 25 mfd 12V—একটা
(৫) ক্যাপাসিটর 1 mfd 50V—একটা
(৬) ক্যাপাসিটর 5 mfd 12V—একটা
(৭) ক্যাপাসিটর 0.1 mfd—একটা
(৮) ক্যাপাসিটর 0.033 mfd—একটা
(৯) রেজিস্টর 10K Ω—তিনটে
(১০) রেজিস্টর 5.6K Ω—দুটো
(১১) রেজিস্টর 1.5K Ω—একটা
(১২) রেজিস্টর 2.2K Ω—একটা
(১৩) রেজিস্টর 3.9K Ω—একটা
(১৪) রেজিস্টর 39K Ω—একটা
(১৫) আই. সি. বোর্ড–একটা

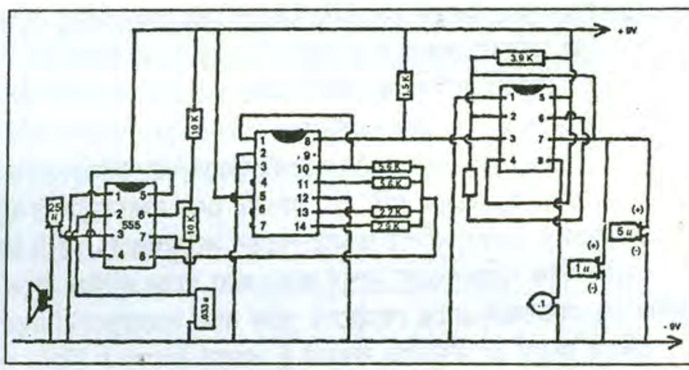

আচ্ছা, প্রত্যেকবারই তো আই. সি. বোর্ডের কোথায় কোন-কোন কম্পোনেন্ট বসবে তা ছবি এঁকে দেখিয়ে দিই। এবারে যদি তা না করে একটু অন্যভাবে দেখাই? খুব কি অসুবিধে হবে? দেখোই না চেষ্টা করে।

এই কলিংবেল ৯ ভোল্ট ব্যাটারিতে কাজ করে। তোমরা যদি এটাকে বাড়িতে কলিংবেল হিসেবেই লাগাতে চাও তা হলে ব্যাটারির বদলে এলিমিনেটর ব্যবহার করাই ভালো। সেক্ষেত্রে এলিমিনেটরকে কীভাবে এর সঙ্গে জুড়বে সেটা নিচের ছবিতে দেখো।

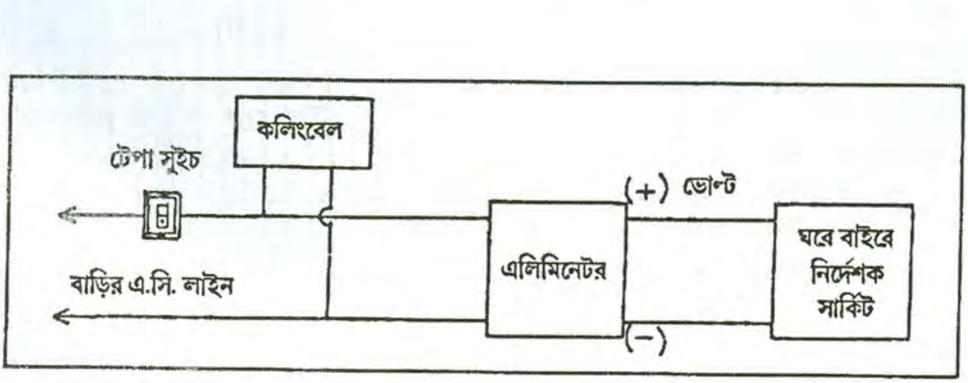

মডেল–৩১

ঘরে-বাইরে

বাড়ির দরজায় শ্রুতিমধুর কলিংবেল লাগিয়েও শান্তি নেই। বুকুনের আব্দার ওকে একটা ইন-আউট ইন্ডিকেটর বানিয়ে দিতে হবে; অর্থাৎ বুকনের কোনও বন্ধু এসে কলিংবেল বাজালেই সঙ্গে-সঙ্গে দরজার ওপর লাগানো একটা ডিসপ্লে বোর্ডে IN অথবা OUT জ্বলে উঠে বুঝিয়ে দেবে বুকুন বাড়ি আছে না নেই।

তিনটে মাত্র সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে হাতের কাছে পেলেই এরকম একটা ইন্ডিকেটর বা নির্দেশ বানিয়ে ফেলা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

আমাদের যা-যা লাগবে তা হল ঃ

(১) END 507 সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে (কমন অ্যানোড)–তিনটে
(২) কিছু আবরণ দেওয়া সরু তার
(৩) ৩ ভোল্টের ব্যাটারি বা এলিমিনেটর
(৪) ছোট আই. সি. বোর্ড–একটা

বইয়ের শেষে 'টুকিটাকি' অংশটা পড়লেই বুঝতে পারবে যে FND-র পিনগুলোকে চিনে নেওয়া মোটেও কঠি কাজ নয়।

FND গুলোকে কীভাবে আই. সি. বোর্ডের ওপর বসাবে বুঝতে পারছ? আচ্ছা, আমি একটু সাহায্য করছি। নিচের ছবিটায় কিভাবে এগুলো বসিয়ে তামার পাতের সংযোগগুলো কেটে নিতে হবে তার একটা ছবি এঁকে দিলাম।

তারের বাকি সংযোগগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য পরের ছবিটার দিকে তাকাও। এখানে আই. সি. বোর্ডটাকে দেখানো হয়নি; তবু এটা দেখে-দেখে তোমাদের পক্ষে বাকি সংযোগগুলো করে নেওয়া নিশ্চয়ই কঠিন কাজ হবে না।

ছবিতে দেখো A বিন্দুটাকে কখনও B আবার কখনও C বিন্দুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। যদি A আর B একসঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে ডিসপ্লেতে IN লেখাটা জ্বলবে; আর যদি A এবং C একসঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে ডিসপ্লেতে OUT লেখাটা জ্বলবে।

অর্থাৎ বুকুন যখন বাড়িতে থাকবে তখন A আর B কে সংযুক্ত করে রাখতে হবে; বাইরে যাওয়ার সময় A আর C- কে জুড়ে দিতে হবে।

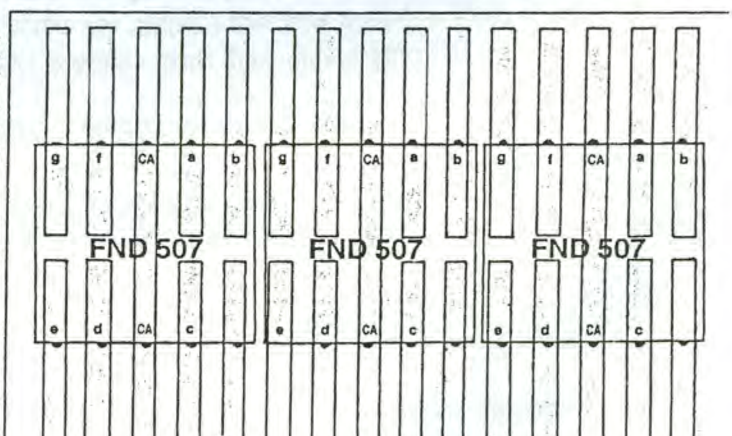

এই জোড়াজুড়ির কাজটা তো ঝালাই করে করা যাবে না; তবে আরও নানান ব্যবস্থা এর জন্য করা যেতে পারে। সেটা কিন্তু আমি ভেঙে বলছি না; এটা বুকুনের সঙ্গে তোমাদেরও ভাবতে হবে।

এবার এটাকে কলিংবেলের সুইচের সঙ্গে ঠিকমতো লাগাতে গেলে তোমাদের নিচের ছবিটা দেখতে হবে।

এই বইয়ে যে কলিংবেলের নকশা দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি সেইটেই ব্যবহার করো, তা হলে একটা এলিমিনেটর থেকেই দুটো সার্কিটে বিদ্যু সরবরাহের ব্যবস্থাটা করতে পারো।

কি, এবার প্রয়োজনমাফিক সব ব্যবস্থা হল তো?

মডেল–৩২

সাইরেন—B

বুকুনের মাথায় এমন অদ্ভুত সব খেয়াল মাঝেমধ্যে চাগিয়ে ওঠে যে তোমরা তা শুনলে শুধু যে ভীষণ অবাক হবে তাই না, খুব একচোট হাসবেও। যেমন ধরো না, ওর হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে ওর সাইকেলের টিং-টিং বেলের বদলে একটা সাইরেন লাগাবে; সেটাই বেলের কাজ করবে। আবার সাইরেনটা এমন হওয়া চাই যে সেটা আপনা-আপনি বাড়বে-কমবে।

আব্দার শুনে বললাম, --এসব তো ভি. আই. পি. -দের গাড়ির সামনে যে পাইলট গাড়ি থাকে তাতে লাগানো থাকে শুনেছি; তুই সাইকেলে লাগিয়ে কী করবি?

বুকুন বললে,–আমিও ভি. আই. পি। যাকগে, তুমি আমায় ওইরকম একটা সাইরেন বানিয়ে দেবে কিনা বলো।

ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা কষতেই হল। তারপর যে জিনিসটা তৈরি হল সেটা অত জোরালো না হলেও সাইকেলের ঘণ্টা হিসেবে ভালোই কাজ করেছিল।

হয়তো তোমাদের মাথাতে এটাকে অন্য কাজে লাগাবার পরিকল্পনাও আসতে পারে।

খুব বেশি জিনিসপত্রের প্রয়োজন নেই। হয়তো এর কিছু-কিছু ট্রানজিস্টর, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর তোমাদের কাছে আগে থেকেই রয়েছে। বেশ, তা হলে নিচের লিস্টটা দেখা যাক।

(১) ট্রানজিস্টর 2SB 75—দুটো
(২) ট্রানজিস্টর AC 176—একটা
(৩) ট্রানজিস্টর AC 128—একটা
(৪) স্পিকার (8 Ω)—একটা
(৫) ক্যাপাসিটর 33 mfd 6V—দুটো
(৬) ক্যাপাসিটর 100 mfd 6V—একটা
(৭) পোটেনশিওমিটার 5K—একটা
(৮) টেপা সুইচ—একটা
(৯) রেজিস্টর 3.3K Ω—দুটো
(১০) রেজিস্টর 100K Ω—দুটো
(১১) রেজিস্টর 10K Ω—একটা
(১২) রেজিস্টর 22K Ω—একটা
(১৩) রেজিস্টর 33K Ω—একটা
(১৪) ব্যাটারি 6 ভোল্টের
(১৫) আই. সি. বোর্ড—একটা

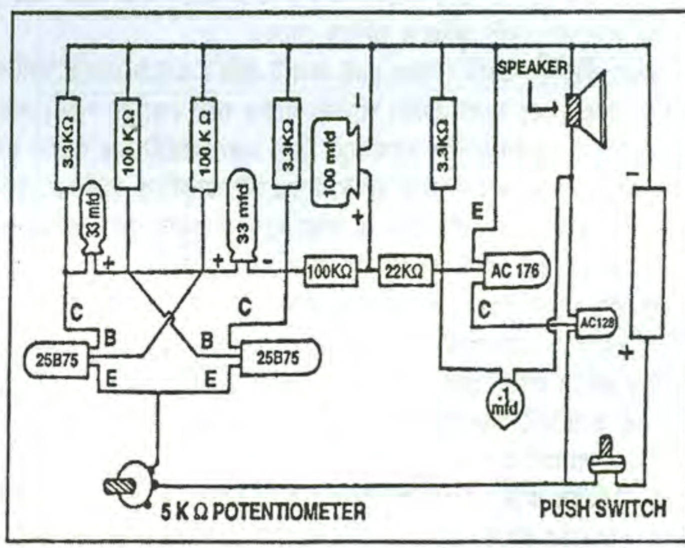

এই মডেলটাতেও কোন কম্পোনেন্ট আই. সি. বোর্ডের কোথায় বসবে তা আর ছবি এঁকে দেখালাম না। মনে হয় এই ছবিটা দেখে এটা তোমরা নিজেরাই করে নিতে পারবে।

এখানে 5K Ω যে পোটেনশিওমিটারটা রয়েছে, ওটা ঘুরিয়েই সাইরেনের বাড়া-কমাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

মডেল-৩৩

সুরেলা গ্রিটিংস কার্ড

শ্রীমান টুকলু এবং বুকুন একেবারে মানিকজোড়, ঠিক 'নন্টে-ফন্টে'র মতো। আর দুজনের একসঙ্গে আবির্ভাব মানেই হৃদকম্প। যাইহোক, সেদিন দুই মক্কেল ঠিক ওরকমভাবেই এসে হাজির হল-এই যে, আমরা এসে গেছি!

হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মনে-মনে বললাম।

তারপরই টুকলু শুরু করল,-মামু, আমরা এবার নববর্ষে নতুন কিছু উপহার দিয়ে ক্লাসের বন্ধুদের চমকে দিতে চাই। কী দেওয়া যায় বলো তো?

-সুপার ফ্যান্টাস্টিক গ্রিটিংস কার্ড!

-ধুৎ! গ্রিটিংস কার্ড! ও আর নতুন কী!

-আরে নন্টে-ফন্টে, না-না। সাধারণ গ্রিটিংস. কার্ড না। এমন একটা গ্রিটিংস কার্ড দিবি, যেটা খুললেই টুং-টাং-টুং, মিষ্টি সুরের খেলা।

-ওফ মামু, দারুণ! শিগ্গির বাতলাও, ওটা কীভাবে বানাব!

টুকুলু আর বুকুনের মতো তোমরা যদি নিজে এই কার্ড তৈরি করে বন্ধু বা গুরুজন কাউকে উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানাও, তা হলে তিনি একেবারে আনন্দে অভিভূত হয়ে যাবেন। কারণ কার্ডটি খোলার সঙ্গে-সঙ্গে অপূর্ব মিষ্টি সুরবিশিষ্ট শব্দে তাঁর মন খুশিতে ভরে যাবে। অবশ্য তার আগে যার হাতে এটি তৈরি হল, গ্রিটিংস কার্ডের মধুর সুরধ্বনি তার মনকেই সবচেয়ে বেশি তৃপ্তিতে ডুবিয়ে দেবে।

এখন কীভাবে তৈরি করবে সেই কথাই বলি। প্রথমে একটা গ্রিটিংস কার্ড সংগ্রহ করতে হবে, যা নিজে বানিয়ে নিতেও পারো। এর মধ্যে একটা পাতলা ধাতুর পাত (তামার পাত)-এর সাহায্যে একটা সুইচ বানিয়ে নিতে হবে। যে সুইচটা কার্ডটি খোলার সঙ্গে-সঙ্গে চালু (on) এবং কার্ডটি বন্ধ করলে বন্ধ (off) হবে। এই সুইচকে পুশ টু অফ (Push to off) সুইচ বলে। এবার ছোট চ্যাপ্টা ট্যাবলেট আকৃতির একটা IC-UM 3166 এবং একটা 1.5 Volt বোতাম ব্যাটারি প্রয়োজন। (হাতঘড়ির ব্যাটারি)। এ ছাড়া লাগবে একটা ছোট রেজিস্টর, কোয়ার্টার ওয়াটের (1.4 watt)। মান 680k। এটি 470k দিলেও কোনও অসুবিধা হবে না। আর এইটুকু জায়গায় স্পিকার তো ব্যবহার করা যাবে না, তাই ব্যবহার করতে পারলেই গ্রিটিংস কার্ড খুললে মিউজিক শোনা যাবে, আবার বন্ধ করলেই পুশ টু অফ সুইচ বন্ধ হয়ে মিউজিক বন্ধ হয়ে যাবে।

যা-যা লাগবে ঃ

১. গ্রিটিংস কার্ড
২. IC-UM 3166
৩. পুশ টু অফ সুইচ
৪. রেজিস্টর, 680k
৫. ব্যাটারি 1.5v or 3 v
৬. পিয়াজো বাজার (Peazzo Buzzer)

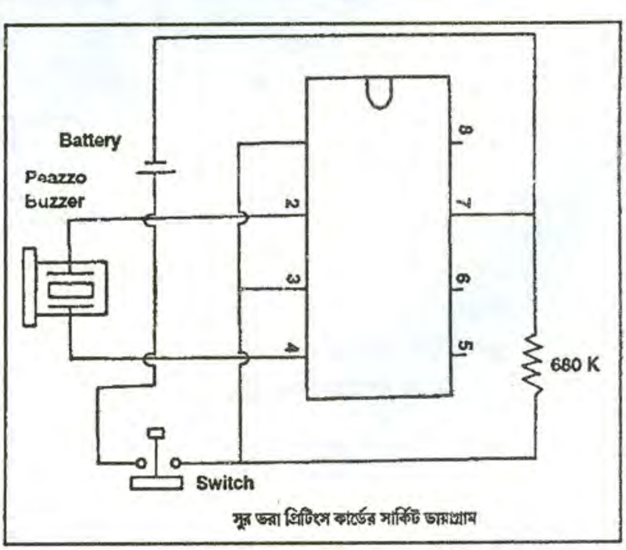

সুর ভরা গ্রিটিংস কার্ডের সার্কিট ডায়াগ্রাম

মডেল–৩৪

টিভি অ্যান্টেনা

টিভির অ্যান্টেনাটা ভেঙে যাওয়ার ক'দিন থেকেই মন খারাপ টুকলুর। নতুন অ্যান্টেনা না কেনা পর্যন্ত ভালো করে ছবিই দেখা যাচ্ছে না।

টুকলুকে এই তালে একটা নতুন বুদ্ধি যোগালাম। বললাম,–অ্যান্টেনাটা নিজেই তৈর করে নে না। আর এখন তো গ্রীষ্মের ছুটি, পড়াশোনারও তো তেমন চাপ নেই।

টুকলু তো সঙ্গে-সঙ্গে এক পায়ে খাড়া। শুরু হয়ে গেল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার তোড়জোড়। যা-যা কিনতে হবে তার তালিকাটা এইরকম ঃ

(১) অ্যালুমিনিয়ামের চৌকো মুখ পাইপ—5 ভাগের 1.2 ফুট (এই পাইপের চৌকো মুখের প্রত্যেকটা প্রান্ত মোটামুটি 0.75 ইঞ্চি করে)।

(২) অ্যালুমিনিয়ামের গোল মুখ পাইপ—29 ভাগের 1.2 ফুট (এই পাইপের চৌকো মুখের ব্যাস হবে 1.2 ইঞ্চি)।

(৩) আধ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ শক্ত করে লাগাবার জন্য ক্ল্যাম্প-তিনটে (সেইসঙ্গে উপযুক্ত বোল্ট এবং নাট)।

(৪) অ্যান্টেনাকে খুঁটির সঙ্গে আটকাবার জন্য বিশেষ ক্ল্যাম্প—একটা।

(৫) প্লাস্টিকের ডাইপোল কভার ও চার ইঞ্চি লম্বা বোল্ট নাট সহ-একটা।

(৬) একটি ছোট গোল আতশ কাচ।

(৭) ধূপকাঠির গোল লম্বা বাক্স।

(৮) কভার গ্লাস-একটা।

(৯) পাতিত (distilled) জল –এক চামচ।

এছাড়া কিছুটা আঠা (ডেনড্রাইট), পেরেক, হাতুড়ি, করাত, ড্রিলমেশিন, স্ক্রু, কালো কালি ইত্যাদি প্রয়োজন হবে।

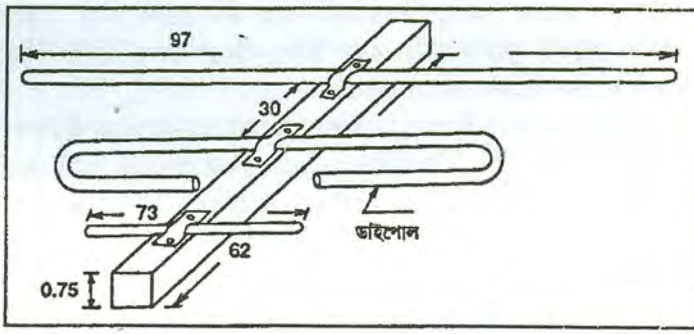

এবার চৌকো মুখ পাইপটার এক ধার থেকে দু-এক ইঞ্চি ছেড়ে 97 ইঞ্চি লম্বা পাইপটাকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে আটকে দাও। এবার আটকাও ডাইপোলটাকে, 30 ইঞ্চি দূরে 73 ইঞ্চি লম্বা পাইপটাকে।

খেয়াল রেখো, এই পাইপগুলো যেন চৌকো পাইপটার সঙ্গে লম্বভাবে থাকে।

ডাইপোল কভারটাকে বোল্টের সাহায্যে চৌকো মুখ পাইপের সঙ্গে এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে নাট শক্ত করে এঁটে দিলে ডাইপোলের খোলা মুখটা ভালো ভাবে ঢাকা পড়ে।

খুঁটির সঙ্গে অ্যান্টেনাকে আটকাবার জন্য যে বিশেষ ক্ল্যাম্পটা রয়েছে সেটার একটা অংশকে চৌকো মুখ করে এঁটে দাও, তা হলেই কাজ শেষ।

এবার শুধু ফিডার কেবল দিয়ে অ্যান্টেনাকে টিভির সঙ্গে সংযুক্ত করা। ব্যস!

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, এই লেখার মধ্যে পাইপের যেসব মাপ বলা হয়েছে, তা ছাড়াও কিন্তু নানান মাপের অ্যান্টেনা হতে পারে।

মডেল–৩৫ আতশ কাচের বদলে

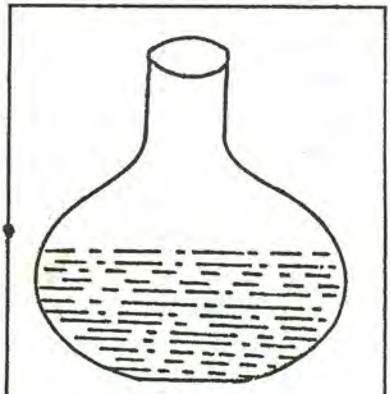
আতশ কাচের বদলে

সেদিন আবার দুই মূর্তিমান একসঙ্গে হইচই করতে করতে হাজির। এসেই শুরু করল,–আজকে স্কুলে জীবনবিজ্ঞান ক্লাসে মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলে কত ছোট-ছোট জিনিসকে বড় দেখলাম। আস্ত সব কোষও স্যার দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু মামা, বাড়িতে কী করে দেখব? মাইক্রোস্কোপের দাম তো অনেক।

তাড়াতাড়ি ওদের কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম,–এর জন্য চিন্তা কি? ফিউজ হয়ে যাওয়া একটা বাতিল বাল্ব জোগাড় করে নাও। এরপর বাল্বের দাতব অংশটার দিকটা ওপর থেকে সাবধানে খুলে ফেলে দাও। বাল্বের মধ্যে পাতিত (distilled) বা পরিষ্কার জল ছবির মতো করে ভর্তি করো। ছবির মতো বাল্বই নেবে।

এবার ধাতব অংশের দিকে চোখ দিয়ে যে জিনিসকে দেখতে চাও সেটা দেখলেই অনেক বড় দেখাবে।

ভাবলাম নিস্তার পেলাম। কিন্তু এত সহজে ভবি ভোলার নয়। একটুক্ষণ চুপ করে থেকেই দুজনে ঘাড় নেড়ে উঠল,–উঁ-হু! মামা, ফাঁকি দিচ্ছ! আমাদের মডেল চাই। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপের সত্যিকারের মডেল।

নে বাব্বা! অগত্যা কী করা, হতাশভাবে বললাম,–কালকে আসিস। চিন্তা করে দেখি, কিছু করতে পারি কি না।

পরের দিনই দুইজন ঠিক হাজির! চিন্তা-ভাবনা করে যা তৈরি করেছিলাম ওদের তা দেখালাম। ওরা তো দারুণ খুশি। দেখো, তোমাদের কেমন লাগে।

মডেল–৩৬ কম খরচে মাইক্রোস্কোপ

মডেলের নাম শুনে ভাবছ মাইক্রোস্কোপ, সে তো অনেক দামের ব্যাপার। সেটা আবার কী করে কম খরচে তৈরি হবে? আচ্ছা, দেখাই যাক খুব কম খরচে সেটা তৈরি হয় কি না।

প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো জোগাড় করে নেওয়া যাক ঃ

(১) 10 ইঞ্চি লম্বা, 1 ইঞ্চি চওড়া, 1 ইঞ্চি মোটা কাঠ-এক টুকরো।
(২) 6 ইঞ্চি লম্বা, 6 ইঞ্চি চওড়া কাঠ–একটুকরো।
(৩) জত(1,2) সেমি ব্যাসযুক্ত, 1 সেমি লম্বা প্লাস্টিকের পাইপ-একটা
(৪) 4 ইঞ্চি লম্বা, 2 ইঞ্চি চওড়া কাঠের টুকরো-চারটে।
(৫) 2 ইঞ্চি লম্বা, 2 ইঞ্চি চওড়া আয়না–একটা।
(৬) একটি ছোট গোল আতশ কাচ।

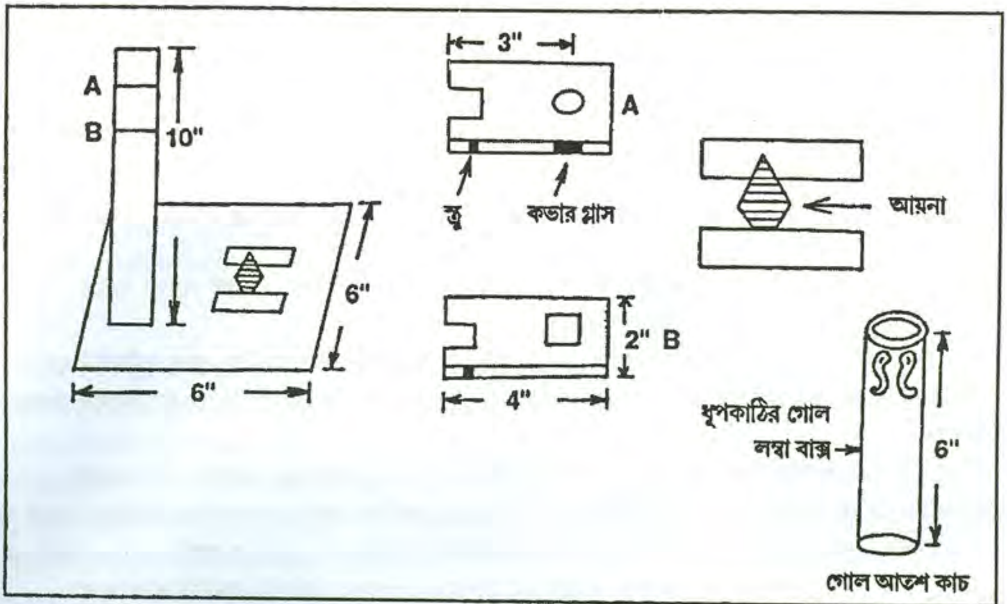

(৭) ধূপকাঠির গোল লম্বা বাক্স।

(৮) কভার গ্লাস–একটা।

(৯) পাতিত (distilled) জল–এক চামচ।

এছাড়া কিছুটা আঠা (ডেনড্রাইট), পেরেক, হাতুড়ি, করাত, ড্রিলমেশিন, স্ক্রু, কালো কাগজ ইত্যাদির প্রয়োজন হবে।

এবার তৈরির কাজে হাত দেওয়া যাক। প্রথমেই বর্গাকার কাঠের ওপর লম্বা বড় কাঠটা লম্বভাবে একটা পেরেক দিয়ে আটকে দাও। এবারে যে চারটে সমান মাপের কাঠের টুকরো আছে সেগুলোর দুটোকে বর্গাকার কাঠের ওপর আটকাও। ছবির মতো করে এমনভাবে আটকাও যাতে ওই দুটো কাঠের টুকরোর মধ্যে আয়নাটা কোনাকুনিভাবে আটকানো যায় এবং আয়নাটা উপর-নিচে ঘোরানো যায়। বাকি দুটো কাঠের টুকরোগুলোর একদিক ছবির (A, B) মতো করে কেটে ফেলো। এবার যে-কোনও একটা টুকরো নিয়ে একদিক থেকে 3" দূরে একটা গর্ত করে তাতে প্লাস্টিকের পাইপটা ঢুকিয়ে কাঠের সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। প্লাস্টিকের পাইপের একদিকে আবার কভার গ্লাসটা আঠা দিয়ে আটকে দাও। ধূপকাঠির বাক্সটা 6" মতো কেটে তার একদিকে ডেনড্রাইট দিয়ে আতশকাচটা আটকে দাও। একটা আইপিস এবার ওই কাঠের পাশে ছবির মতো করে স্ক্রু আটকে লম্বা কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে দাও। এমনভাবে স্ক্রু আটকাও যাতে স্ক্রু ঘুরিয়ে কাঠটাকে সহজে ওঠানো-নামানো যায়। বাকি কাঠটাকে একদিক থেকে তিন ইঞ্চি দূরে 1" × 1" বর্গাকারে গর্ত করে ওটাকেও আগের মতো স্ক্রুর সাহায্যে লম্বা কাঠের গায়ে আগের লাগানো কাঠের নিচে লাগিয়ে দাও। ব্যস, মোটামুটি তৈরির পালা শেষ।

একটা হাইড্রা কিংবা অ্যামিবার স্লাইড নিয়ে B-কাঠের গর্তের ওপর রাখো। A-কাঠের পাইপের গর্তে কয়েক ফোঁটা পাতিত জল দিয়ে দাও। আইসিসে চোখ দিয়ে এবার জলের কিছু ওপরে চোখ রেখে আয়নার আলো আর স্লাইড এদিক-ওদিক সরাতে থাকো; দেখবে তোমার তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে হাইড্রো কিংবা অ্যামিবা কত বড় দেখাচ্ছে।

এখন বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে যন্ত্রটা কীভাবে কাজ করছে তা বরং দেখা যাক। পাইপের নিচে কভার গ্লাস থাকায় জল নিচে দিয়ে পড়ে যাচ্ছে না, আবার জলের পৃষ্ঠ-টানের ফলে জলের উপরিতল উত্তল হয়ে উঠেছে। ফলে জল এখন উত্তল লেন্সের কাজ করছে। আর তোমরা তো জানোই উত্তল লেন্স কীভাবে বিবর্ধক হিসাবে কাজ করে।

সবশেষে বলে রাখি, যন্ত্রটা তৈরির সময় সঠিক মাপ সম্পর্কে সতর্কতা নেওয়া দরকার।

Component-এর নাম	যে তিনটি পাতে লাগানো হবে তাদের নম্বর		
	বেস্	এমিটর	কালেক্টর
ট্রানজিস্টর BC 157	14	13	15
ট্রানজিস্টর 2N 222	4	3	5

বুকুনকে বলি, —ব্যাটারি লাগানোর সময় কিন্তু খুব সাবধান; কারণ নেগেটিভ আর পজিটিভ উলটো-পালটা হয়ে গেলেই আই. সি. পুড়ে যাবে। তাই প্রথমেই ৯ ভোল্টের ব্যাটারি না লাগিয়ে একটা ১.৫ ভোল্টের ব্যাটারি লাগিয়ে দেখতে হবে আই. সি. টা গরম হচ্ছে কি না। যদি গরম হয় তাহলে বুঝতে হবে ব্যাটারি সংযোগ উলটো হয়েছে, না হয় সার্কিট তৈরিতেই কোথাও গোলাযোগ রয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাটারির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভুলটা কোথায় হয়েছে খুঁজতে হবে।

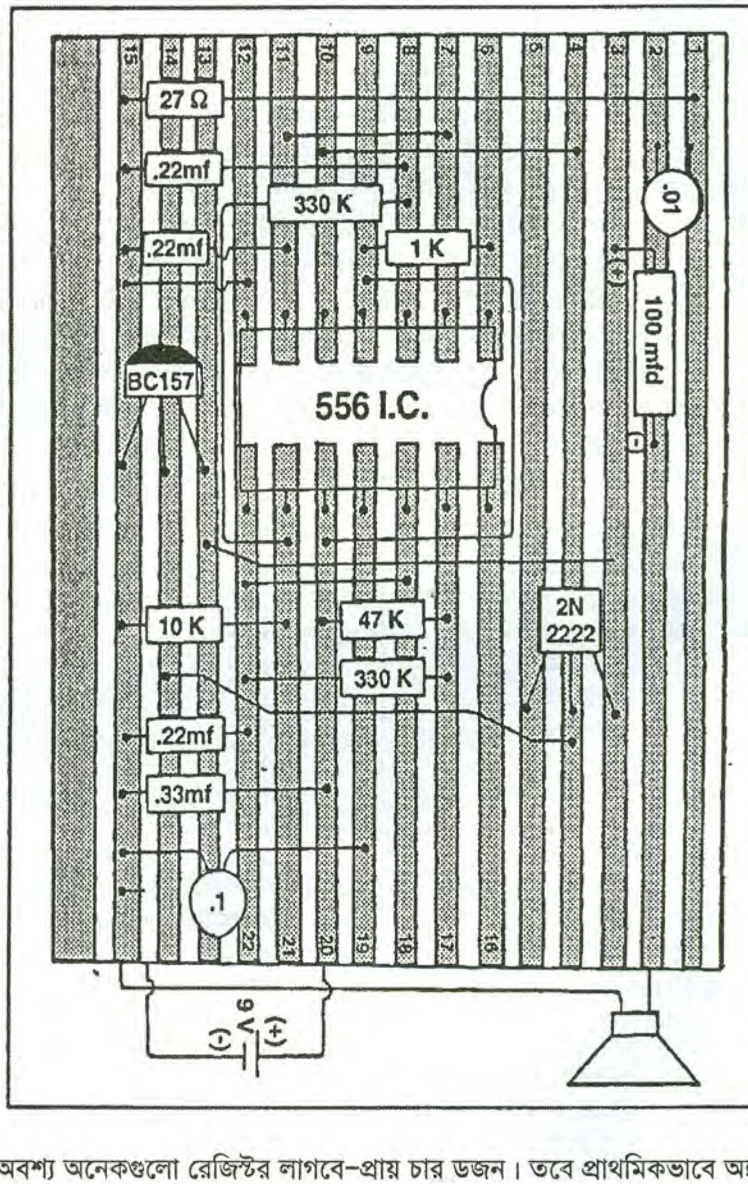

এই পর্যন্ত তৈরি হওয়ার পর বুকুন বলল,—সবই তো হল, কিন্তু তোমার অর্গান বাজছে কোথায়?

বললাম,— সে ব্যবস্থা তো এখনও হয়নি। অর্গান থেকে বিভিন্ন সুর তৈরি করার জন্য এবার বিভিন্ন মানের কতকগুলো রেজিস্টর যোগ করতে হবে। রেজিস্টরের মানগুলো আমি যা হিসেব করেছি তাতে করে চেহারাটা দাঁড়িয়েছে ভীষণ বিদঘুটে; এরকম রেজিস্টর তো বাজারে পাবি না।

তা হলে! —বুকুন বোধহয় একটু হতাশ হয়।

ওকে আশ্বস্ত করি; বলি,— সেজন্য অন্য ব্যবস্থাও আমি ভেবে রেখেছি। কতগুলো রেজিস্টরকে কখনও series আবার কখনও parallel করে জুড়ে কাজটা চালিয়ে নেওয়া যাবে। এর জন্য অবশ্য অনেকগুলো রেজিস্টর লাগবে–প্রায় চার ডজন। তবে প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকটা রেজিস্টর লাগিয়ে দেখতে পারিস।

রেজিস্টরের তালিকাটাও বেশ লম্বাই–

BANSDOC Library
Accession No. 21091

1k Ω—তিনটে	150 Ω—একটা	330 Ω—তিনটে
120 Ω—দুটো	27 Ω—তিনটে	74 Ω—দুটো
68 Ω—তিনটে	560 Ω—চারটে	22 Ω—একটা
820 Ω—দুটো	100 Ω—একটা	
82 Ω—একটা	56 Ω—দুটো	270 Ω—দুটো
33 Ω—তিনটে	470 Ω—তিনটে	10 k Ω—দুটো
680 Ω—চারটে	390 Ω—তিনটে	10 Ω—একটা

এবার সঙ্গের ছবিটার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কোথায় কোন রেজিস্টারটা কীভাবে জুড়তে হবে। রেজিস্টরের এই যে মালা তৈরি হল তার এক প্রান্ত সংযুক্ত হবে মূল ভেরোবোর্ডের ৭ নম্বর পাতে। ৬ নম্বর পাতে একটা লম্বা তার ঝালাই করে তার অপর প্রান্তটায় একটা লম্বা আর শক্ত তামার তার বা ওই জাতীয় কিছু লাগিয়ে দিতে হবে। এবার রেজিস্টরের যে মালাটা তৈরি হয়েছে তার বিভিন্ন সংযোগ বিন্দুতে ওই শক্ত তামার তারটাকে ঠেকালে জন্ম নেবে বিভিন্ন সুর।

বুকুন বললে,–ওভাবে তার ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে আর্গান বাজানো আমার পোষাবে না। তার চেয়ে আমি কতকগুলো টেপা সুইচ লাগিয়ে নেব।

বললাম,–এতে আর অসুবিধের কী আছে? টেপা সুইচ লাগাতেই পারিস, ইচ্ছে হলে কায়দা করে আসল অর্গানের মতো রিডও বানিয়ে নিতে পারিস। যদি জোর আওয়াজের প্রয়োজন হয় তাহলে একটা অ্যামপ্লিফায়ারও ব্যবহার করতে পারিস।

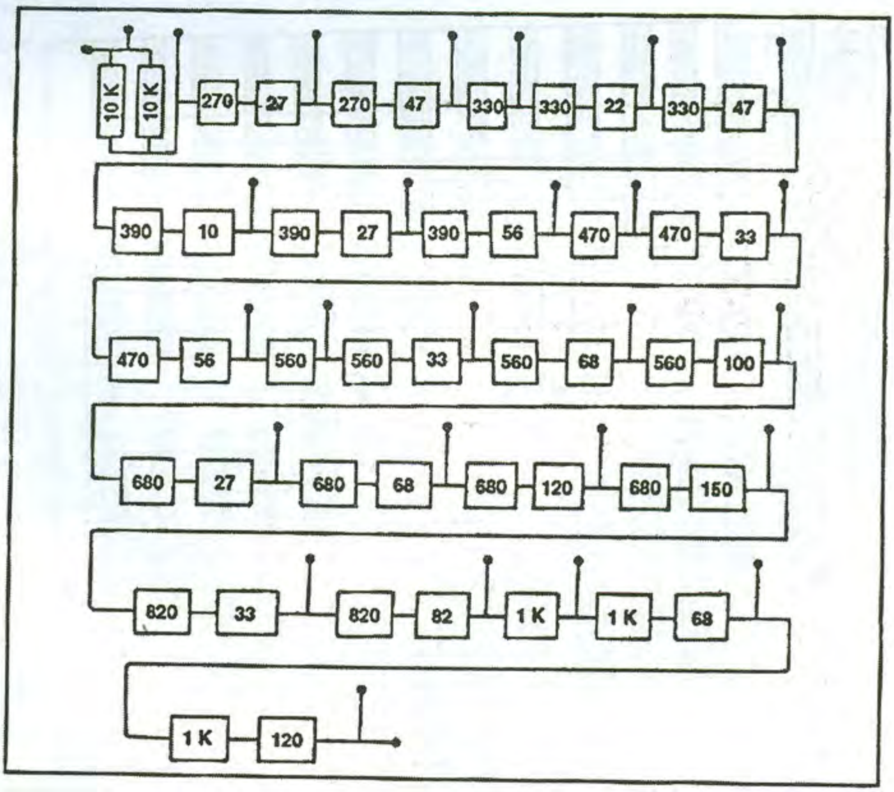

মডেল–২১

ইলেকট্রনিক ছক্কা

লুডো খেলতে বসলেই বুকুন গণ্ডগোলটা বাধায়। বারেবারেই ওর ছক্কাটা ছিটকে গিয়ে পড়ে বোর্ডের বাইরে। আর মজা হল, যতবার সেটা বোর্ডের বাইরে গিয়ে পড়ে ততবারই ছয়, কিন্তু বোর্ডের ওপর কিছুতেই আর "ছয়' পড়েছে না; কিন্তু বোর্ডের বাইরে গিয়ে পড়েছে তখন সেটা ইনভ্যালিড। এই নিয়ে বাক্য বিনিময় হতে-হতে আমি বোধহয় একবার বলে ফেলেছিলাম,–এর পরে তোর সঙ্গে খেলতে ইলেকট্রনিক ছক্কা লাগবে।

বুকুনও ছাড়ার পাত্র নয়। বললে,–বেশ তো বানিয়ে দাও না ইলেকট্রনিক ছক্কা তারপর দেখব কে জেতে।

ভেবেছিলাম ব্যাপারটা হয়তো সেদিনেই চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু সেটি হওয়ার জো নেই। ক'দিন পরেই শ্রীমানের আবির্ভাব ঘটল ইলেকট্রনিক ছক্কা বানিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে।

সুতরাং-প্রয়োজনীয় জিনিপত্রের তালিকা তৈরি করতেই হল।

১। আই. সি. CD 4017 (বেস সহ)–একটা

২। আই. সি. 555 (বেস সহ) –একটা

৩। LED-ছটা

৪। ক্যাপাসিটর 0.01 mfd—দুটো

৫। রেজিস্টর 47 K Ω—একটা

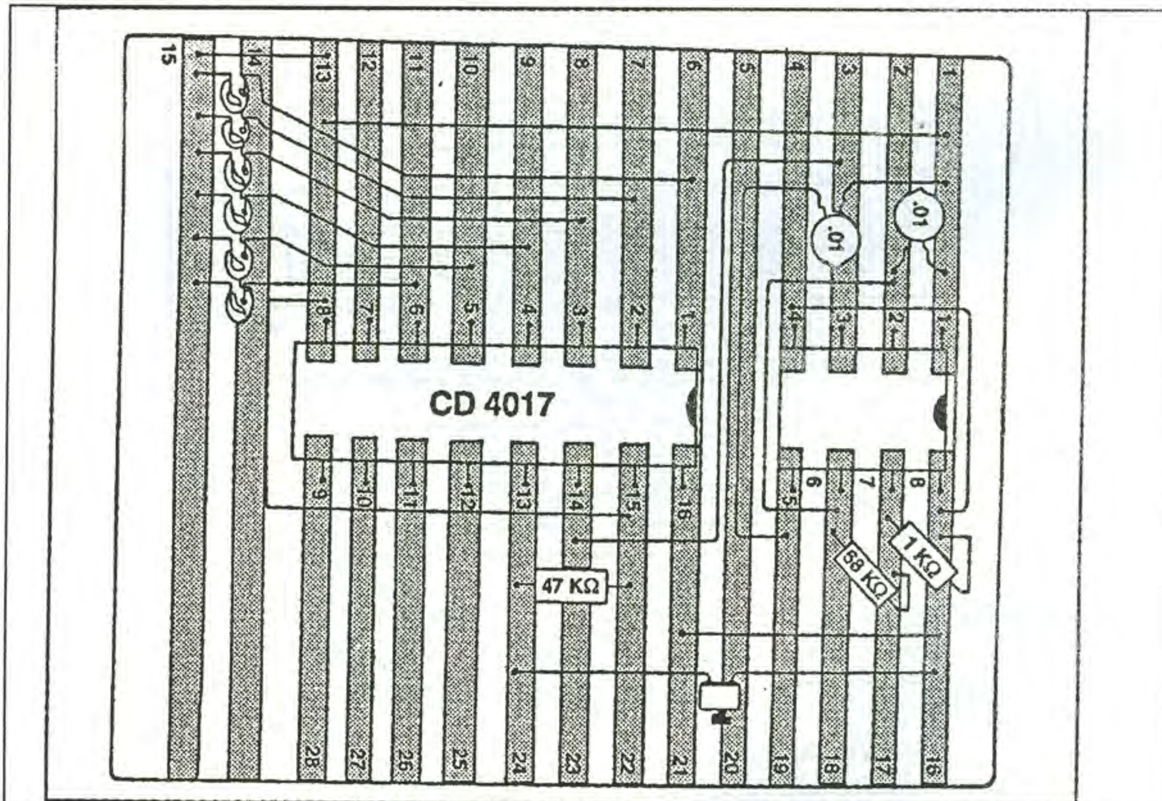

৬। রেজিস্টর I K Ω—একটা

৭। রেজিস্টর 6.8 K Ω—একটা

৮। টেপা সুইচ–একটা

৯। আই. সি. বোর্ড–একটা

I. C. বোর্ডটার ওপরের দিকে 555 নম্বর আই. সি. টা বসিয়ে নেওয়া হল; তার নিচে হল CD 4017 আই. সি. টা। তোমরা তো জানোই কীভাবে আগে আই. সি. বেস বসিয়ে তার ওপর আই. সি. টা কে বসানো হয় এবং তারপর কীভাবে তামার পাতের সংযোগগুলো কেটে দিতে হয় তা-ও জানো। ছবিটা দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তামার পাতগুলোর নম্বর দিয়ে নাও।

এবার কোথায় কোন Component বসবে তার একটা চার্ট বানিয়ে দিচ্ছি; আশা করি এতে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হবে।

Component-এর নাম	যে দুটি পাতে লাগানো হবে তাদের নম্বর	
আবরণ দেওয়া তার	16	21
আবরণ দেওয়া তার	3	23
আবরণ দেওয়া তার	1	13
আবরণ দেওয়া তার	13	15
আবরণ দেওয়া তার	13	22
আবরণ দেওয়া তার	2	18
আবরণ দেওয়া তার	4	16
0.01 ক্যাপাসিটর	1	2
0.01 ক্যাপাসিটর	1	19
I K Ω রেজিস্টর	16	17
6.8 K Ω রেজিস্টর	17	18
4.7 K Ω রেজিস্টর	22	24
টেপা সুইচ	16	24

এবার 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11—ছটা পাতের প্রত্যেকটায় এক-একটা LED-র পজিটিভ প্রান্ত যোগ করো; আর তাদের প্রত্যেকের নেগেটিভ প্রান্তটাকে পাঠিয়ে দাও 15 নম্বর তামার পাতে।

যন্ত্র তৈরি শেষ। এবার ব্যাটারি সংযোগের পালা। ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত যোগ হবে 1 নম্বর পাতে আর পজিটিভ প্রান্ত যোগ হবে 8 নম্বর পাতে। 6 ভোল্ট বা 9 ভোল্টের যে-কোনও ব্যাটারি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ব্যাটারি সংযোগের সময় পজিটিভ আর নেগেটিভ যেন উলটে-পালটে না হয়; তাহলেই আই. সি.-র পঞ্চত্ব প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আর ব্যাটারি সংযোগের পর আই. সি.-র. কোন পিনে হাত না দেওয়াই ভালো; বিশেষ করে CD 4017-এর তো নয়ই। এতে তোমার ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নেই; কিন্তু আই. সি. টা (CD 4017) নষ্ট হওয়ার একটু আশঙ্কা রয়েই যায়।

ব্যাটারি লাগানোর সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল ছটা LED জ্বলে আছে। এবার যেই তুমি এই টেপা সুইচটা টিপবে অমনি দেখবে একটাই মাত্র LED জ্বলে আছে; সুতরাং ছক্কাটা আর বোর্ডের বাইরে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রইল না। তবে মাঝেমধ্যে সুইচ টিপে হয়তো দেখবে কোনও LED-এর ছাড় নেগেটিভ প্রান্তগুলো 15 নম্বর পাতেই সংযুক্ত কর। এবার এক-একটা LED-র জন্য এক-একরকম নম্বর বরাদ্দ রাখ। আমি একটা চার্ট বানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এটাকে বদলাতেও পারো।

LED-র নম্বর	বরাদ্দ নম্বর
1	+4
2	-5
3	+2
4	-3
5	+10
6	-15
7	+1
8	+3
9	-6
10	-4

এবার যতজন ইচ্ছে একসঙ্গে খেলা শুরু কর। মনে কর, তুমি সুইচ টিপলে; 1 নম্বর LEDটা জ্বলল; তা হলে তুমি পেলে -15; তাহলে তোমার মোট পয়েন্ট হল +4-15=-11। এইভাবে খেলাটা চলতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিযোগীদের কারুর নম্বর মোট 50 হচ্ছে। কিংবা 50-এর বদলে টার্গেট নাম্বার 100-ও ধরতে পারো; তাতে খেলাটা আরও দীর্ঘসময় ধরে চলবে।

ঘরে আটকানো বর্ষার দিনে খেলাটা বুকুন আর তার বন্ধুদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়ই হয়েছিল।

মডেল–২২ ইঁদুর কল

দেখো হে, আমার শ্রীমানটিকে দিয়ে তুমি যেসব মডেল বানাও সবই অকর্মের, কোনওটাই কোনও কাজে লাগে না। ওই যে একটা ইলেকট্রনিক ছক্কা না ফক্কা কী বানিয়েছিলে। ওটা নিয়ে আমি কী করব বলতে পারো? – অনিমেষ দা'র লম্বা খেদোক্তি।

বললাম,–সে তো বটেই; তবে এখনই আপনার পকেট হাতড়ালে বোধহয় রিচার্জেব্‌ল টর্চটা পাওয়া যাবে।

ওটা হল আলাদা ব্যাপার। –অনিমেষ দা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন ঃ লোডশেডিং না থাকলে আমি ওসব থোড়াই পকেটে রাখতাম।

–আচ্ছা বেশ; ধরুন আপনার ট্যাঙ্কে ওই পানি মাপার ব্যবস্থাটা!

–ওটা খুব সাধারণ ব্যাপার! আর বুকুনটাও হয়েছে যেমন; পাম্প কতক্ষণ চলল সেটা খেয়াল রাখতে হবে না! তার জন্যও কিনা যন্তর চাই!

–ও! তা হলে এটাও কোনও কাজের জিনিস তৈরি হয়নি?

একদম না, একদম না বিকাশদা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়েন।

কিন্তু আমিও হার মানার পাত্র নয়। বললাম,–বুকুনের কাছে শুনলাম আজকাল নাকি আপনিও ওই মিনি গীজারটা লাগিয়ে স্নানের জল গরম করে নিচ্ছেন, বৌদি বিরক্ত না করেই।

-ওটা তো কেবল শীতকালের জন্য; তারপর তো আর প্রয়োজনই হবে না।

আমি বললাম-ব্যাপারটা যা দাঁড়াল অনিমেষ দা তাতে মালুম হচ্ছে প্রয়োজনের সময় সবই আপনার কাজে লাগছে; অন্যসময় অপ্রয়োজনীয়। সেই যে একটা প্রচলিত কথা আছে না-কাজের বেলায় কাজি/কাজ ফুরলেই পাজি।

অনিমেষ দা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন,–আরে না-না তা হবে কেন? এমন একটা কিছু বানানো দরকার যেটা সবসময় কাজে লাগবে।

-কীরকম?

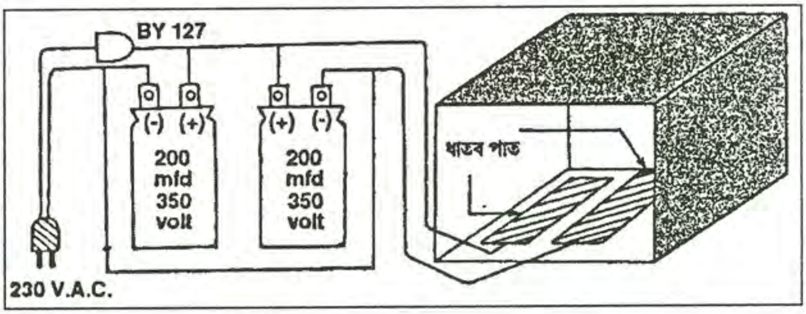

খানিক মাথা চুলকে, সিগারেটে লম্বা দুটো টান মেরে, একটুক্ষণ চোখ বুজে থেকে অনিমেষ দা হঠাৎ বলে উঠলেন,–ইঁদুর।

আমি বলি, ইঁদুর আবার তৈরি করা যায় নাকি?

–আরে দূর! তোমার মাথাটাও কি একদম গেছে? ইঁদুর তৈরি করবে কেন? চাই ইঁদুর পাকড়াবার একটা এফেক্টিভ কল। বাড়ির যত জাঁতিকল–সব ইঁদুর ব্যাটেলিয়ানের কাছে হার মেনেছে। তোমাদের ইলেকট্রনিক্স এ ব্যাপারে কি কিছু করতে পারে?

কথাগুলো বলে অনিমেষ দা এমনভাবে তাকালেন যে ভাবখানা এই ঃ হুঁ-হুঁ বাবা, এবার কেমন বেকায়দায় ফেলেছি!

এবার আমি একটু নড়েচড়ে বসি। বলি,–দেখুন অনিমেষ দা, আপনি যা চাইছেন তা কিন্তু আমি বানিয়ে দিতে পারি; তবে তাতে ইঁদুর যে শুধু ধরা পড়বে তা নয়; ইঁদুর-কলেই তাকে প্রাণবিসর্জন দিতে হবে।

'ইঁদুরের প্রাণবিসর্জন' কথাটা শুনে অনিমেষ দা খানিক হো-হো করে হাসেন তারপর বলেন,–ঠিক হ্যায়, লে যাও তুমহারা স্যাঙাৎ কো!

কাজ শুরু হয়ে গেল সেদিন বিকেল থেকেই। যা-যা প্রয়োজন তার লিস্টটা সকালেই শ্রীমান বুকুনের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেল জিনিসপত্র সব এসে গেছে। লিস্টখানা ছিল এইরকম ঃ

১. BY 127 ডায়োড-একটা

২. 200 mfd 350 V কন্ডেন্সার-দুটো।

৩. খানিকটা ধাতুর পাত (তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন যা পাওয়া যায়)।

৪. দুটো সুবিধাজনক কাঠের বাক্স।

৫. কিছু আবরণ দেওয়া তার, প্লাগটপ ইত্যাদি।

এবার কাজ শুরু করার পালা।

একটা ছোট্ট কাঠের বাক্সের মধ্যে কন্ডেন্সার দুটোকে বসাও; কন্ডেন্সার দুটোর পজিটিভ প্রান্ত জুড়ে দাও একটা তার দিয়ে; নেগেটিভ প্রান্তদুটো জোড়ো অন্য একটা তার দিয়ে।

এবার কন্ডেন্সারের পজিটিভ প্রান্তে জুড়ে দাও ডায়োডের ক্যাথোডটা (ছবিতে দেখো)। ডায়োডের অ্যানোড প্রান্তে একটা তার আর কন্ডেন্সারের নেগেটিভ প্রান্তে আর একটা তার ঝালাই করে তার দুটোর অপর প্রান্ত দুটো প্লাগটপটায় লাগিয়ে নাও। এবার প্লাগটপটা বাড়ির এ. সি. সাপ্লাই-এ লাগাও। তবে, লাগাবার সময় একটা জিনিস খেয়াল রেখো, ডায়োডের অ্যানোড থেকে যে তারটা এসেছে সেটা যেন এ. সি. সাপ্লাই-এর লাইভ পয়েন্টে যায়। (লাইভ পয়েন্ট কীভাবে চিনতে হয় জানো নিশ্চয়ই। এ কাজে বরং বড়দের একটু সাহায্য নিও। প্লাগের গর্তদুটোতে টেস্টার লাগিয়ে দেখতে হবে কোনটায় টেস্টার জ্বলছে। যে পয়েন্টে টেস্টার জ্বলবে সেটাই লাইভ পয়েন্ট।)

যারা ডি. সি. এলাকায় থাকো, তাদেরকে ওই ডায়োডটা ব্যবহার করতে হবে না। তারা সরাসরি কন্ডেন্সারের পজিটিভ প্রান্ত ডি. সি. সাপ্লাই লাইনের পজিটিভে এবং কন্ডেন্সারের নেগেটিভ প্রান্ত ডি. সি. সাপ্লাই লাইনের নেগেটিভ সংযোগ করবে; ভুল যেন না হয়।

এখনও আরও কিছু কাজ বাকি।

দ্বিতীয় কাঠের বাক্সটার মধ্যে বাক্সের ভেতর দিকের নিচের তলে দুটো ধাতব পাতকে ইঞ্চি খানেক ফাঁক রেখে পেরেক দিয়ে আটকে দাও। খেয়াল রেখো বাক্সের সাইজটা এমন হওয়া চাই যাতে ইঁদুর সহজেই ভেতরে ঢুকতে পারে; কারণ এটাই তার আসল ডেথ ট্র্যাপ। এবার ওই ধাতব পাত দুটোর একটায় কন্ডেন্সারের পজিটিভ প্রান্ত থেকে একটা তার এনে সংযোগ করো; অপর পাতটায় কন্ডেন্সারের নেগেটিভ প্রান্ত থেকে একটা তার এনে সংযোগ করো।

কাজ শেষ।

এবার অনিমেষ দা'কে বললাম–আপনার গৃহবাসী ইঁদুরবাহিনীর জন্য ডেথ ট্র্যাপ প্রস্তুত। ওই ধাতুর পাতদুটোর ওপর ইঁদুর ভায়াদের কিছু প্রিয় খাবার রেখে দিন এবং তারপর প্লাগটাকে মেন সাপ্লাই-এ লাগিয়ে দিন।

–এতেই ইঁদুর কুপোকাতে হবে তো? অনিমেষ দা'র প্রশ্ন।

বললাম–শুধু ইঁদুর কেন, অসাবধান হয়ে কাজ করলে আপনিও এখান থেকে শক খেতে পারেন। তাই কতকগুলো কথা সবসময় মনে রাখবেন–

(১) মেন সাপ্লাই-এ প্লাগ লাগানো হয়ে যাবার পর যন্ত্রের কোনও অংশে হাত দেওয়া চলবে না; কারণ সর্বত্রই তখন হাই ভোল্টেজ।

(২) সকালবেলা উঠেই মেন সাপ্লাই থেকে প্লাগটা আগে খুলতে হবে। পড়ে থাকা ইঁদুরের দেহটি সৎকারের জন্য তখনই টানাটানি করা চলবে না। কারণ তখন কন্ডেন্সার দুটো চার্জ হয়ে বসে থাকে। অন্তত ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করাই ভালো।

যদি অতক্ষণ অপেক্ষা করার সময় না থাকে তাহলে একটা মোটা আবরণ দেওয়া তার সাবধানে ধরে কন্ডেন্সারের পজিটিভ আর নেগেটিভ প্রান্তে একসঙ্গে ঠেকিয়ে কন্ডেন্সার দুটোকে ডিসচার্জ করিয়ে নিতে হবে।

মডেল–২৩ অ্যামপ্লিফায়ার

এবারে জন্মদিনে বুকুন তার বড়মামার কাছ থেকে একটা ছোট্ট টেপরেকর্ডার উপহার পেয়েছিল। এক্কেবারে ছোট; প্যান্টের পকেটের মধ্যে সহজেই ঢুকে যায়। জিনিসটা বুকুনের ভারি পছন্দ হয়েছে, কিন্তু একটা মুশকিল হল যে, এটা শোনার সময় কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনতে হয়।

এ মুশকিলটা আসান করতে গিয়েই বুকুনকে এই অ্যামপ্লিফায়ার বানানোর প্ল্যানটা দিলাম। তোমরাও তোমাদের ছোটখাট প্রয়োজনে এটাকে সহজেই ব্যবহার করতে পার।

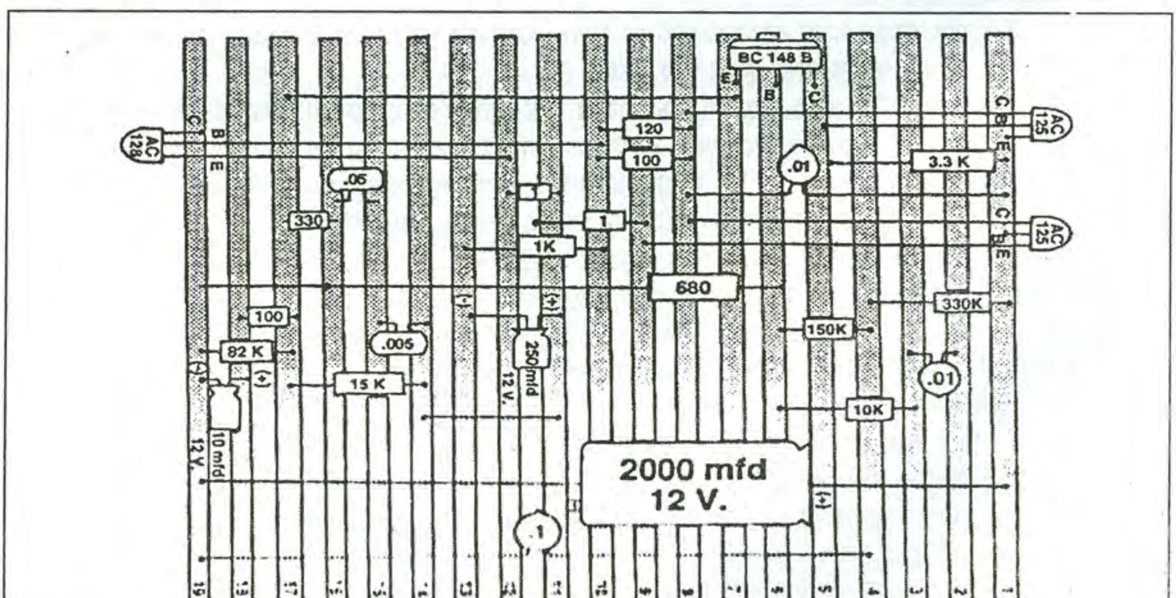

অ্যামপ্লিফায়ারটা তৈরি করতে কী-কী লাগবে দেখে নাও ঃ

১. ট্রানজিস্টর ঃ BC 148 B—একটা
AC 128—একটা
AC 127—একটা
AC 125—একটা

২. কন্ডেন্সার ঃ 200 mfd 12 Volt—একটা
250 mfd 12 Volt—একটা
10 mfd 12 Volt—একটা
0.1 mfd—একটা
0.1 mfd—একটা .05 mfd—একটা
0.1 mfd—দুটো .005 mfd—একটা

৩. রেজিস্টর ঃ 15 K Ω—একটা 100 Ω—একটা
1 K Ω—একটা 330 Ω—একটা
120 Ω—একটা 82 Ω—একটা
1 Ω—একটা 220 K Ω—একটা
3.3 K Ω—একটা 680 K Ω—একটা
330 K Ω—একটা 10 K Ω—একটা
150 K Ω—একটা

৪। পোটেনশিওমিটার ঃ 20 K W (without switch)—একটা।
1 M Ω (with switch)—একটা

৫। বড় আই. সি. বোর্ড–একটা

৬। 15 Ω স্পিকার–একটা

আই. সি. বোর্ডের তামার পাতগুলোকে যথারীতি নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কোথায় কোন Component যোগ হবে তার জন্য নিচের চার্টের দিকে তাকাও।

Component-এর নাম	যে দুটি পাতে লাগানো হবে তাদের নম্বর	
0.1 ক্যাপাসিটর	4	19
2000 mfd 12 V ক্যাপাসিটর	পজিটিভ—1	নেগেটিভ—19
.01 ক্যাপাসিটর	2	3
10 K Ω রেজিস্টর	3	6
150 K Ω রেজিস্টর	4	6
330 K Ω রেজিস্টর	1	4
680 K Ω রেজিস্টর	6	19
250 mfd 12 Volt ক্যাপাসিটর	পজেটিভ—11	নেগেটিভ—13
.005 ক্যাপাসির	14	15
15 K Ω— রেজিস্টর	14	17
100 Ω— রেজিস্টর	17	18
82 Ω— রেজিস্টর	17	19
10 mfd 12 V ক্যাপাসিটর	পজেটিভ—18	নেগেটিভ—19
330 Ω— রেজিস্টর	16	17

.05 mfd ক্যাপাসিটর	15	16
1 K Ω— রেজিস্টর	10	13
1 Ω— রেজিস্টর	9	11
100 Ω— রেজিস্টর	11	12
120 Ω— রেজিস্টর	8	10
3.3 Ω— রেজিস্টর	1	5
.01 Ω— ক্যাপাসিটর	1	8
আবরণ দেওয়া তার	7	17
আবরণ দেওয়ার তার	11	14

ট্রানজিস্টরের	যে তিনটি পাতে সংযুক্ত হবে তাদের নম্বর		
	বেস	কালেক্টর	এমিটর
AC 125	5	8	1
AC 127	1	8	9
AC 128	10	19	12
BC 148 B	6	5	7

আই. সি. বোর্ডের ১৩ আর ১৯ নম্বর পাতে স্পিকারটাকে যোগ করো। 20 K Ω tone control পোটেনশিওমিটার যেটা রয়েছে তার মাঝের পয়েন্ট আর যে-কোনও ধারের একটা পয়েন্ট সরাসরি একটা তার দিয়ে সংযোগ করে দাও। এবার ওই পয়েন্টটা থেকে একটা তার ১৫ নম্বর পাতে জুড়ে দাও। একলা পড়ে থাকা অপর পয়েন্টটার সংযোগ ঘটাও ১৪ নম্বর পাতে। 1 M Ω volume control পোটেনশিওমিটারটার মাঝের পয়েন্টটা ২ নম্বর পাতে সংযুক্ত হবে। ধারের একটা পয়েন্ট ১৯ নম্বর পাতে জুড়তে হবে। অবশিষ্ট অন্য পয়েন্টটা ১৯ নম্বর পাত থেকে টেনে নাও। পিক-আপ এর সংযোগ কীভাবে করবে সেটা পরে বলছি।

এই অ্যামপ্লিফায়ারটা চালাতে 9 volt-এর ব্যাটারি লাগবে। ব্যাটারিটাকে একটা সুইচের মাধ্যমে সংযোগ করলে ভালো হয়। ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তটাকে ১ নম্বর পাতে লাগিয়ে দাও; নেগেটিভ প্রান্তটাকে লাগাও ১৯ নম্বর পাতে।

কাজ শেষ। এবার শোনার পালা।

টেপরেকর্ডার বা রেডিওর যেখানে একটা OUT PUT পয়েন্ট আছে, সেখানে ওই pick-up-এর পয়েন্ট দুটোকে উপযুক্ত জ্যাকের সাহায্যে লাগিয়ে দাও। কিংবা এটাকে তোমরা রেকর্ডপ্লেয়ারের অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো।

মডেল–২৪ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মজার খেল

বিজ্ঞানের প্রদর্শনী।

এই প্রথম বুকুনদের স্কুলে বিজ্ঞানের বিভিন্নরকম মডেলের ছোটখাটো একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

কিন্তু বুকুনের মন ভারি খারাপ। কারণ প্রদর্শনীর প্রস্তুতি যখন চলছিল, তখন একইসঙ্গে চলেছিল ওদের পরীক্ষাও। ফলে কোনও মডেল ওর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সেই দুঃখের কথাই সেদিন ওর কাছে শুনছিলাম।

শুনতে-শুনতেই মাথায় একটা নতুন প্ল্যান এল।

বললাম,–শোন, দুঃখ করিস না। তুই আর তোর বন্ধুরা মিলে তোদের মাস্টারমশাইকে গিয়ে বল যে পরীক্ষার জন্যে তোরা তো মডেল বানাতে পারিসনি, তাই তোদের ওপর যেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটার ভার দেওয়া হয়।

দূর ও অনেক ঝামেলার ব্যাপার। –বুকুন মুখটাকে ভার করেই রাখে।

বললাম,–বাহরাও নিবি অথচ ঝামেলাও হবে না–তা কী করে হয়?

না-না তা নয়। –হাত নেড়ে বুকুন বলে ওঠে ঃ আসলে

উদ্বোধনের দিন কী অনুষ্ঠান হবে, কে সভাপতি হবে, কোথায় স্টেজ হবে... ও সব আমার দ্বারা হবে না। –আচ্ছা বেশ। ওগুলো না হয় তোর বন্ধুরাই করবে।

–তা হলে আমি কী করব?

–তুই! সভাপতি যে ফিতে কেটে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন সেটার ব্যবস্থা করবি।

আমার কথাগুলো মোটেই বুকুনের পছন্দ হচ্ছিল না; উঠেই দাঁড়াল চলে যেতে।

ডেকে বললাম,–শেষটাতো শুনলি না, শুনলে তোরই ভালো হতো।

শেষটা আবার কী?–কণ্ঠস্বরে রাগের লক্ষণ পরিষ্কার।

আরে মজাটা তো শেষেই। যখন সবাই দেখবে ফিতে কাটার সঙ্গে-সঙ্গেই একসারি আলোর মালা জ্বলে উঠল। কিংবা মাইকে বেজে উঠল মাঙ্গলিক সুর, তখন তো সবাই জানতে চাইবে কী করে এটা হল। আর ...

এবার বুকুনকে বেশ উৎসাহিত মনে হয়। থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল,–সত্যিই এরকম করা যাবে?

–কেন করা যাবে না? অবশ্য যদি তোরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভার নিস তবেই না!

–সে আমি সব ম্যানেজ করে নেব। তার আগে বলো এটার জন্য কী-কী চাই। ঝামেলা খুব একটা হবে না তো?

চটপট একটা প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা বানানো হল ঃ

(১) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিলে (6V DC, SPDT)—একটা

(২) প্লাগ টপ-একটা

(৩) প্লাগ বেস-একটা

(৪) 6 ভোল্টের ব্যাটারি–একটা

(৫) একটা টেপরেকর্ডার ও উপযুক্ত বাজনা রেকর্ড করা ক্যাসেট

(৬) লম্বা লাল ফিতে বেশ খানিকটা। তোমরা অনেকেই হয়তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিলে এই প্রথম ব্যবহার করছ। সুতরাং এটাকে খুব ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার।

এটা আসলে একটা তড়িৎ-চুম্বক। একটা লোহার ছোট দণ্ডকে ঘিরে থাকে একটা তারের কুণ্ডলী; কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠালে ওই লোহার টুকরোটা চুম্বকের ওপরে থাকে একটা পাতলা লোহার পাত। সাধারণ অবস্থায় স্প্রিং-এর টানে এই লোহার পাতটি ওপরের ধাতব পাতকে ছুঁয়ে থাকে। আর তড়িৎ-চুম্বকে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে তড়িৎ-চুম্বকের আকর্ষণে সে নিচের পাতটিকে ছোঁয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেই সে ফিরে যায় আগের অবস্থায়।

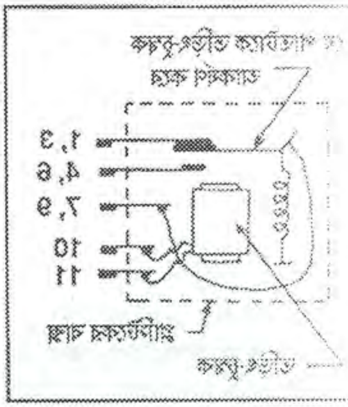

সাধারণভাবে সমস্তরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিলের কর্মপদ্ধতি এইরকমই। তবে চেহারার অনেক রকমফের আছে বইকি।

আমরা এখানে যে রিলেটা ব্যবহার করব তার ক্ষেত্রে পুরো ব্যবস্থাটাই রাখা থাকে একটা প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে।

রিলের সমস্ত সংযোগ বিন্দুগুলোকে এবার খুব ভালো করে চিনে নেওয়া দরকার। যে ধাতবপাতটি ওপরের পাতটিকে সবসময় ছুঁয়ে থাকে তার সংযোগ বিন্দুটিকে প্লাস্টিকের বাক্সটার মধ্যে তাকালে সহজেই চিনে নেওয়া যাবে। একইভাবে নিচের পাতের বাইরের সংযোগ বিন্দুটিকে চিনে নেওয়া কঠিন নয়। লোহার পাতটির সঙ্গে একটি সরু তার ঝালাই করে প্লাস্টিকের বাক্সের বাইরে বের করে রাখা হয়; এটিও আর-একটি সংযোগ বিন্দু। তড়িৎ-চুম্বকে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানোর জন্য আরও দুটি সংযোগ বিন্দু থাকে।

বুকুন যে রিলেটা কিনে আনল তার পিছন দিকে দেখি মোট আটটা সংযোগ বিন্দু রয়েছে। ১ আর ৩ নম্বর দেওয়া সংযোগ বিন্দুর যে-কোনও একটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে ওপরের পাতে সংযোগ স্থাপনের জন্য। ৪ আর যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে ৭ বা ৯ যে-কোনওটির সাহায্যেই। ১০ আর ১১ নম্বর এই দুটো সংযোগ বিন্দুকে একসঙ্গেই ব্যবহার করতে হবে তড়িৎ-চুম্বকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সরবরাহের জন্য।

বুকুনকে বললাম,–লাল ফিতেটার পিছনে একটা সরু তার খুব সাবধানে সেলাই করে বা আঠা দিয়ে আটকে দে- যাতে সেটা কোনওমতেই চোখে না পড়ে।

ব্যবস্থা হল সেইমতোই। লাল ফিতের ওপর সরু লাল তার লাল সুতো দিয়ে এমনভাবে সেলহি হল যে এক নজরে বোঝে কার সাধ্যি!

সেই তারের একটা প্রান্ত লাগিয়ে দেওয়া হল রিলে ১১ নম্বর সংযোগ বিন্দুতে, অন্য প্রান্তটা 6V ব্যাটারির এক প্রান্তে। ব্যাটারির অন্য প্রান্তটি সরাসরি সংযুক্ত হল রীলের ১০ নম্বর বিন্দুতে।

প্লাগটপ থেকে একটা তার সরাসরি প্লাগবেসে লাগিয়ে দেওয়া হল। প্লাগটপ থেকে আর-একটা তার এল ৭ নম্বর সংযোগ বিন্দুতে (অর্থাৎ লোহার পাতটিতে; তোমার রিলেটিতে এই পাতটি ৭ নম্বর বিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত না-ও থাকতে পারে; ভালো করে দেখে নাও।) আর প্লাগবেস থেকে অপর তারটি এল ১ নম্বর সংযোগ বিন্দুতে (অর্থাৎ ওপরের পাতটিতে; সাধারণ অবস্থায় লোহার পাতটি ওকেই ছুঁয়ে থাকে। তোমার রিলেতে এই পাতটি ১ নম্বর বিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত নাও থাকতে পারে; ঠিক করে দেখে নাও।)

এবার প্লাগটপটিকে এ. সি. লাইনের প্লাগে লাগিয়ে দেওয়ার পালা। তবে তার আগে ইলেকট্রিকের কাজ জানেন এমন কাউকে দিয়ে সংযোগগুলো ঠিকঠাক হয়েছে কি না তা দেখিয়ে নিতে ভুল না; কারণ এখানে যে ২২০ ভোল্ট এ. সি. বিদ্যুৎ ব্যবহার করছ! আর বিভিন্ন সংযোগ হয়ে যাওয়ার পর প্লাগটপকে এ. সি. লাইনের প্লাগে লাগানোর আগে রিলেটাকে আলাদাভাবে একটা কাঠ বা প্লাস্টিকের বাক্সে রাখতেও যেন ভুল না।

কাজ তো মোটামুটি শেষ।

বুকুনকে বললাম,–এবার তোদের পছন্দমতো বাজনা টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করে রেখে দে। ওই প্লাগবেস যেটা লাগানো হয়েছে তার সঙ্গেই টেপরেকর্ডারটাকে লাগিয়ে দে। টেপরেকর্ডারের PLAY সুইচটা কিন্তু টিপেই রেখে দিবি আগে থেকে। টুনি বাল্ব দিয়ে WELCOME লেখা হয়েছিল; সেটাকেও জুড়ে দেওয়া হল ওই প্লাগবেসে।

তারপর? তারপর উদ্বোধনের দিন লাল ফিতেটা কাঁচি দিয়ে কাটার সঙ্গে-সঙ্গেই বেজে উঠল স্বাগত বাজনার সুর, জ্বলে উঠল WELCOME লেখা আলোর মালা। ছেলেরা তো সবাই অবাক; মাস্টারমশাইরাও। আর বুকুনের চোখে খুশির ঝিলিক।

কিন্তু কেমন করে হল ব্যাপারটা? একটু বুঝিয়ে বলো দিকি। –বুকুন এসে ধরে বসল আমাকে।

বললাম,–খুব সোজা ব্যাপার। রিলের কাজ তো তোকে আগেই বুঝিয়ে বলেছি। এবার যতক্ষণ ব্যাটারির থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু রয়েছে ততক্ষণ ওই লোহার পাতটা নিচের পাতকে ছুঁয়ে থাকবে; আর ওই পাতের সংযোগ বিন্দুটা দ্যাখ-ওখানে কিছুই লাগানো হয়নি। ফলে প্লাগটপ থেকে একটা লাইন কিছুতেই প্লাগবেসে আসতে পারছে না। কিন্তু যেই ফিতেটা কাটা হল অমনি ব্যাটারির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল, তড়িৎ-চুম্বক তার চৌম্বকত্ব হারাল আর ওই পাতলা লোহার পাত ফিরে গেল ওপরের পাতের গায়ে; সঙ্গে-সঙ্গে ৭ আর ১ নম্বর সংযোগ বিন্দুর মধ্যে ওই লোহার পাতের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হল, ফলে প্লাগবেসে পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে টেপরেকর্ডারও চলতে শুরু করল; আর ওই প্লাগবেস থেকে টুনিবাল্বের মালাতেও লাইন টানা হয়েছিল বলে সেটাও জ্বলে উঠল।

মডেল–২৫ দেশলাই কাঠি দিয়ে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো

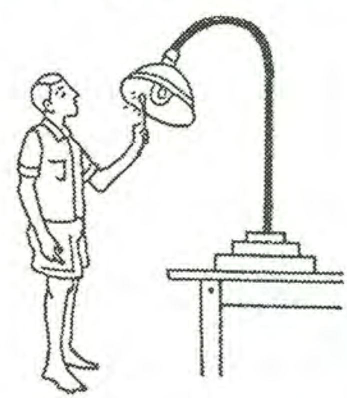

ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি টিউবলাইটের স্টার্টারটা একটু নাড়াচাড়া করে বললেন,–এটায় আর চলবে না; আমি একটা নতুন লাগিয়ে দিচ্ছি।

অকেজো স্টার্টারটা বুকুন ফেলেই দিতে যাচ্ছিল। আমার চোখে পড়তেই বললাম,–ওরে, ওটাকে ফেলিস না; যত্ন করে রাখ, ওটা দিয়েই একটা মজাদার মডেল তৈরি হয়ে যাবে।

–সত্যি! বুকুন চোখ বড়-বড় করে।

–তা নয়তো কী। একটা টুনি বাল্ব আর খানকয় ব্যাটারি জোগাড় কর তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি কী করে দেশলাই কাঠি দিয়ে ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালাতে হয়।

দেশলাই কাঠি দিয়ে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো?–অনিমেষ দা অর্থাৎ বুকুনের পিতৃদেব তো অট্টহাসিতে ফেটেই পড়লেন : তুমি কি আজকাল ম্যাজিক-ট্যাজিকও শিখছ নাকি?

বললাম,–ম্যাজিক নয় অনিমেষ দা, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্তরও ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে কত যে মজার জিনিস তৈরি হতে পারে!

আমাদের কথাবার্তার অবসরেই শ্রীমান বুকুন টর্চ খুলে ব্যাটারি, টুনি আর ইলেকট্রিকের মিস্ত্রির কাছে থেকে খানিকটা তার জোগাড় করে ফেলেছে।

সুতরাং কাজ শুরু হয়ে গের।

প্রথমেই স্টার্টারের বাইরের ঢাকনাটা খুলে ফেলা হল। দেখা গেল ভেতরে রয়েছে একটা লম্বাটে ধরনের বাল্ব আর-একটা ক্যাপাসিটর। এমনভাবে বাল্বের কাচটা ভেঙে ফেলা হল যাতে করে ভেতরের অংশটা কোনওক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

বাল্বের মধ্যে রয়েছে সরু লম্বাটে দুটো ধাতব পাতঃ খুবই পাতলা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে তারা বুঝি একে অপরকে ছুঁয়ে রয়েছে। তা কিন্তু নয়; খুব সামান্য হলেও তাদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রয়েই গেছে।

এবার স্টার্টারের দুটো সংযোগবিন্দুর একটাকে সরাসরি সংযুক্ত করা হল টুনিবাল্বের একপ্রান্তে। অন্য সংযোগ বিন্দুকে সংযুক্ত করা হল ব্যাটারির যে-কোনও একপ্রান্তে। ব্যাটারির অপর প্রান্তটা বাল্বের অপর প্রান্তে জুড়ে দেওয়া হল।

কাজ শেষ।

এবার অনিমেষ দাকে বললাম,–দিন আপনার লাইটারটা দিন। আচ্ছা থাক আমায় দিতে হবে না, আপনিই বরং লাইটারটা জ্বালিয়ে ওই স্টার্টারের ভাঙা বাল্বের নিচে ওই ধাতব পাতদুটোর কাছে ধরুন।

অল্প সময় যেতো-না-যেতেই জ্বলে উঠল টুনিবাল্ব।

বুকুন হাততালি দিয়ে ওঠে। বলে,–বাঃ, বেশ মজা তো।

বললাম,–এবার ফুঁ দে ওই জায়গাটায়; দেখবি আলো নিভে গেছে।

তোমরা ওই ভাঙা স্টার্টার আর বাল্ব-দুটোকেই একটা টেবিল ল্যাম্পের শেডের মধ্যে এমনভাবে বসাতে পারো যাতে ওই স্টার্টারটাকে একেবারেই দেখা না যায়।

এবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে শেডের মধ্যে স্টার্টারটার কাছে ধরলেই আলোটা জ্বলে উঠবে, মনে হবে সত্যিই যেন তুমি দেশলাই-এর আগুনে বৈদ্যুতিক বাল্টাকে জ্বালালে।

কী করে এই মডেলটা কাজ করছে এটা বোঝা কিন্তু খুব সোজা। এই মডেলে ওই স্টার্টারটাকে ব্যবহার করা হয়েছে একটা সুইচ হিসেবে। ওই যে ধাতব পাতদুটো খুব কাছাকাছি রয়েছে; দেশলাই-এর আগুনের গরমে, ওরা আয়তনে বাড়ে; তাই একে অন্যের গায়ে ঠেকে গিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ সম্পূর্ণ করে। আবার ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করলে ওরা আগের অবস্থায় ফিরে আসে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আলোও নিভে যায়।

তোমাদের কাছে যদি ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক ঘণ্টা থাকে তাহলে এই মডেলটাকেই তোমরা একটু অন্যভাবে ফায়ার-অ্যালার্ম হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো।

মডেল–২৬ ইনভার্টার

সিঁড়িটার প্রথম ধাপে পা দিতেই ঝুপ করে অন্ধকার ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। লোডশেডিং!

হাতড়ে-হাতড়ে সাবধানে পা ফেলছি; হঠাৎ কানে এল দোতলা থেকে অনিমেষ দার কণ্ঠস্বর।

–কি রে! আলোও গেল আর পড়াও বন্ধ করলি!

–কী করব? বুকুনের কাতর প্রশ্ন।

–হ্যারিকেনটা জ্বেলে বাকি পড়াটুকু শেষ করো।

দরজায় কড়া নাড়তে অনিমেষ দার দরজা খুললেন। ভেতরেও অন্ধকার; তখনও হ্যারিকেন জ্বলেনি।

আমাকে দেখেই অনিমেষ দার খেদোক্তি,–এক্কেবারে লোডশেডিংকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলে!

বললাম,–লোডশোডিং কি আমার পোষা কুকুর যে আমি এলেই লেজ নাড়তে-নাড়তে ছুটে আসবে?-মুখে-মুখে তর্ক কোরো না তো; এসো ভেতরে এসো; সাবধানে; দেখো কোনও কিছুতে গুঁতো খেও না।

এ বাড়ির ঘর বারান্দা সবই আমার চেনা; তাই গুঁতো খাওয়ার ভয় নেই। ভয় বেশি অনিমেষ দার কথার গুঁতোতে।

ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতেই তাই অনিমেষ দার উদ্দেশ্যে বললাম,–আপনাকে কতবার বলেছি একটা ইনভার্টার কিনে নিন, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার অন্তত সুবিধে হবে।

দরজায় ছিটকিনি আটকে হ্যারিকেনটা হাতড়াতে-হাতড়াতে অনিমেষ দা বললেন,–কিনব কেন? তুমিই একটা বানিয়ে ফ্যালো না।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে ইতিমধ্যেই বুকুনের আবির্ভাব ঘটেছে। ইনভার্টারের কথা শুনেই ও লাফিয়ে উঠল, –সত্যি, তাহলে খুব মজা হবে।

বললাম,–মজাটা বুঝবি ওটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর; তখন লোডশেডিং-এর সময়ও পড়তে হবে।

অনিমেষ দা সঙ্গে-সঙ্গে ফোঁস করে ওঠেন আমার কথা শুনে,–ভাইপোর মাথাটা তো এই করেই খেলে। আমি ভাবছি লোডশেডিং-এর সময় যাতে ও চোখ বাঁচিয়ে পড়তে পারে সেজন্য একটা ইনভার্টার সত্যিই দরকার, আর তুমি কিনা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিলে ওই যন্তরটি এলে ওকে বেশি পড়তে হবে। দুদিন সময় দিলুম; এর মধ্যে ইনভার্টার তৈরি না হলে তোমার সঙ্গে আমার একহাত হয়ে যাবে, হ্যাঁ।

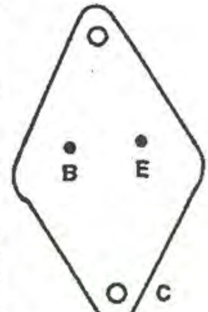

2N 3055

শমন যখন জারি হয়েই গেল তখন তাড়াতাড়ি একটা ছোটখাট ইনভার্টার তৈরির জন্য দরকারি যন্ত্রপাতির লিস্ট বানাতে হয় :

(১) ট্রানজিস্টর 2N 3055 (হিট সিঙ্ক সহ)–একটা
(২) ক্যাপাসিটার 4 mfd 350 Volt—একটা
(৩) রেজিস্টর 50 W, 5 Watt—একটা
(৪) ট্রান্সফরমার Step up, Centre tap' primary, 6-0-6 Volt primary, 230 Volt secondary, current-1A—একটা
(৫) ট্রান্সফরমার Step down, Centre tap secondary, 230V primary, 9-0-9 Volt secondary, current-1A-একটা
(৬) ডায়োড BY 127—দুটো
(৭) স্টোরেজ ব্যাটারি (6V)—একটা
(৮) টিউবলাইট (দু ফুট লম্বা, 20 Watt)—একটা

এছাড়াও টিউবলাইটের জন্য সাধারণ প্লাস্টিক ক্ল্যাম্প, তার, স্ক্রু-এসব তো লাগবেই।

তোমরাও যারা এরকম একটা ছোট ইনভার্টার বানাতে চাও, তারাও আমার সঙ্গে হাত লাগাও না। তবে একটা কথা খেয়াল রেখো –এ মডেলে সবচেয়ে দামি জিনিস হল স্টোরেজ ব্যাটারিটা। একটা ভালো কোম্পানির 6 Volt-এর স্টোরেজ ব্যাটারি প্রায় আড়াইশো টাকার মতো দাম।

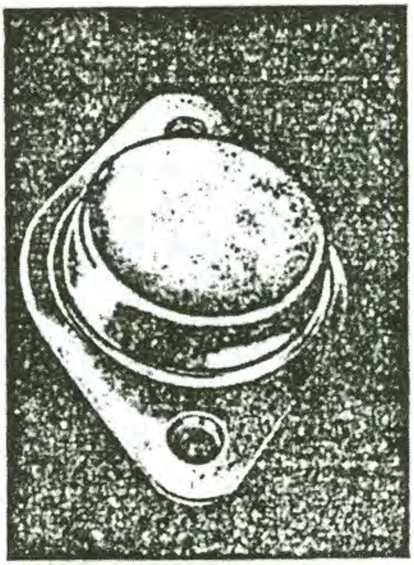

প্রথমেই ট্রানজিস্টরটাকে হিট সিঙ্কের গায়ে স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে নাও। এই ট্রানজিস্টরটা খুব বেশি গরম হয় বলেই তার সঙ্গে এই তাপ-মুক্তির ব্যবস্থা; নইলে ট্রানজিস্টরটা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

এ জাতীয় ট্রানজিস্টর তোমরা হয়তো প্রথম ব্যবহার করছ। তাই এর সঙ্গে তোমাদের একটু আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক। ট্রানজিস্টরটাকে যদি উলটো করে ধরো তা হলে দেখবে এর দুটো মাত্র ছোট-ছোট ঠ্যাং আছে। ঠ্যাংদুটো থেকে একটা প্রান্তের দূরত্ব বেশি, অন্য প্রান্তের দূরত্ব কম।

যে প্রান্ত থেকে ঠ্যাংদুটোর দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম সেই প্রান্তটাকে ওপরের দিকে রাখো। তা হলে এবার বাঁ-দিকের ঠ্যাংটা হবে বেস আর ডানদিকের ঠ্যাংটা হবে এমিটার।

আর কালেক্টর? ট্রানজিস্টরের পুরো ধাতব শরীরটাই হল কালেক্টর।

প্রথমে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারটাকে (এর কাজ ভোল্টেজকে বাড়িয়ে দেওয়া) একটা কাঠের টুকরোর ওপর বসিয়ে নাও; কাঠের টুকরোটার একদিকে হিট সিঙ্ক লাগানো ট্রানজিস্টরটাকেও স্ক্রু দিয়ে আটকে দাও।

এবার ট্রানজিস্টরের কালেক্টর অর্থাৎ তার ধাতব গা বা হিট সিঙ্কে একটা তার লাগিয়ে তারের অপর প্রান্তটা স্টেপ ট্রান্সফরমারের যেদিকে তিনটে পয়েন্ট আছে তার যে-কোনও একধারের পয়েন্টে ঝালাই করে দাও। অন্যধারের পয়েন্টে ক্যাপাসিটরের পজিটিভ প্রান্ত ঝালাই করো। ক্যাপাসিটরের নেগেটিভ প্রান্ত জুড়ে দাও ট্রানজিস্টরের বেসে। রেজিস্টরটরও একটা প্রান্ত ট্রানজিস্টরের বেসে জোর; অন্য প্রান্তটা ক্যাপাসিটরের পজিটিভ প্রান্তে।

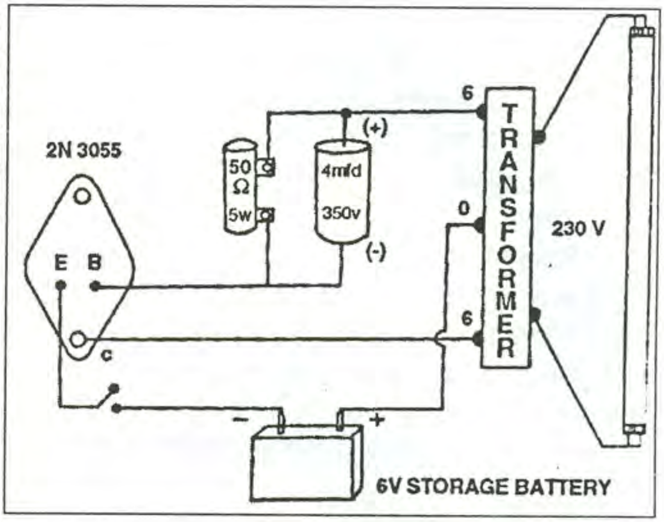

টিউবলাইটের দুটো প্রান্তেই দুটো-দুটো করে ছোট-ছোট লীড বেরিয়ে আছে দেখতে পাবে। সেগুলোকে ছবির মতো করে মোটা তার দিয়ে জুড়ে দাও। এবার টিউবলাইটের দুটো প্রান্ত থেকে দুটো লম্বা তার এনে সংযোগ করে দাও। ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারিতে (অর্থাৎ যেদিকে ট্রান্সফরমারের দুটো মাত্র পয়েন্ট আছে)।

৬ ভোল্টে স্টোরেজ ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তে একটা তার লাগিয়ে তারের অপর প্রান্তটা জুড়ে দাও ট্রান্সফরমারের প্রাইমারির (অর্থাৎ যে দিকে তিনটে পয়েন্ট আছে) মাঝের পয়েন্টে। ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তকে সংযুক্ত করো ট্রানজিস্টরের এমিটরের সঙ্গে একটা সুইচ তো অবশ্যই লাগাতে হবে। সেটা ব্যাটারির পজিটিভের সঙ্গেই লাগানো ভালো।

এবার দেখো টিউবলাইট জ্বলছে কি না।

কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। স্টোরেজ ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ খরচা করার পর তার ভাণ্ডার আবার পূরণ করে দিতে হয়। এর জন্য ব্যাটারিকে চার্জ করার প্রয়োজন।

সাধারণত এই জাতীয় স্টোরেজ ব্যাটারি বা সঞ্চয়-কোষের মধ্যে থাকে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং তার মধ্যে ডোবানো থাকে অনেকগুলি সমান্তরাল লেড পারঅক্সাইডের প্যাকেট (এরা ধনাত্মক পাতের কাজ করে) এবং একেবারে বিশুদ্ধ স্পঞ্জি লেডের পাত (এরা ঋণাত্মক পাতের কাজ করে)। যখন এই কোষ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তখন লেড পারঅক্সাইড সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় তৈরি করে লেড সালফেট এবং জল। ফলে সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘনত্ব কমে আর ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক পাতগুলিও লেড সালফাইটের আস্তরণে বিভূষিত হয়।

ব্যাটারিগুলো চার্জ করার জন্য দোকানে দেওয়া যেতে পারে; কিংবা খুব সহজে এগুলোকে বাড়িতেও চার্জ করে নেওয়া যায়। এর জন্য যা-যা লাগবে তার লিস্ট তো প্রথমেই রয়েছে।

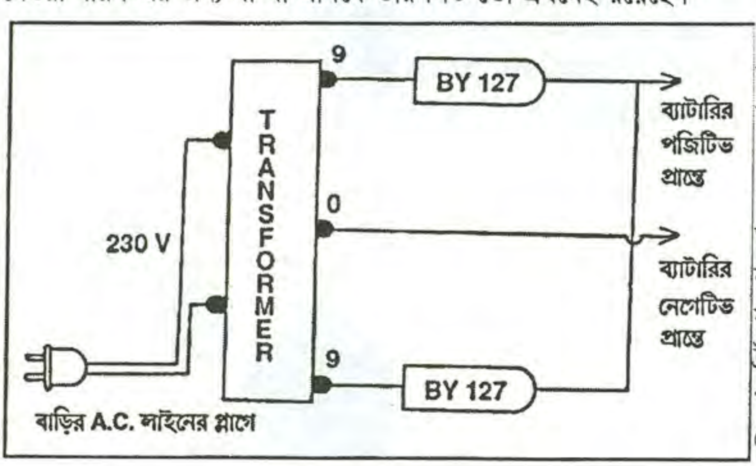

স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারটাকে একটা কাঠের টুকরোর ওপর বসিয়ে নেওয়া যাক। এর সেকেন্ডারির দুধারের দুটো পয়েন্টে BY 127 ডায়োডর অ্যানোড বা পজিটিভ প্রান্ত ঝালাই করে দাও। ডায়োড দুটো ক্যাথোডে একসঙ্গে জুড়ে নাও। এখান থেকে একটা লম্বা তার সংযোগ করো ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তে। ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারির মাঝের পয়েন্ট থেকে আর-একটা তার ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে সংযোগ করো।

ট্রান্সফরমারের প্রাইমারিটাকে বাড়ির এ. সি. লাইনে পাঠাও।

এতক্ষণে কাজ পুরোপুরি শেষ।

যখন লোডশেডিং হবে তখন সুইচ টিপে টিউবলাইট জ্বালাবে। আর যখন বিদ্যুৎ ফিরে আসবে তখন সুইচ অফ করে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিকে বাড়ির এ. সি. লাইনে লাগিয়ে ব্যাটারিটাকে চার্জ করবে। সাধারণত যতক্ষণ টিউবলাইট জ্বলে তার প্রায় তিনগুণ সময় ধরে ব্যাটারিকে চার্জ করতে হয়।

মাঝেমধ্যে ব্যাটারির মধ্যেও নজর রাখতে হবে; দেখতে হবে অ্যাসিডের স্তর খুব বেশি নেমে গেল কি না; যদি নেমে গিয়ে থাকে তা হলে পরিশুদ্ধ জল (ডিস্টিলড ওয়াটার) খানিকটা ঢেলে দিতে হবে। এই ডিস্টিলড ওয়াটার শিশি বা বোতলে ভরা অবস্থায় পেট্রোল পাম্প এবং ইনভার্টারের দোকানে কিনতে পাবে।

মাঝেমধ্যে ব্যাটারির মধ্যেও নজর রাখতে হবে; দেখতে হবে অ্যাসিডের স্তর খুব বেশি নেমে গেল কি না; যদি নেমে গিয়ে থাকে তা হলে পরিশুদ্ধ জল (ডিস্টিলড ওয়াটার) খানিকটা ঢেলে দিতে হবে। এই ডিস্টিলড ওয়াটার শিশি বা বোতলে ভরা অবস্থায় পেট্রোল পাম্প এবং ইনভার্টারের দোকানে কিনতে পাবে।

এ ছাড়াও দেখবে, ব্যাটারির সংযোগ বিন্দুগুলোতে একরকম সাদা-সাদা বা নীল রঙের জিনিস জমে উঠছে। এর জন্যে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই; মাঝেমধ্যে ওইসব জায়গাগুলো একটু ঘষে পরিষ্কার করে দিও।

মডেল-২৭

ডিজিটাল ঘড়ি

কোনও বন্ধুর হাতে ডিজিটাল ঘড়ি দেখে বুকুনেরও শখ-তারও একটা ডিজিটাল হাতঘড়ি চাই। কদিন আগে অবশ্য ছোটমামার কাছ থেকে ও একটা হাতঘড়ি বাগিয়েছে; কিন্তু সেটা তো ডিজিটাল নয়।

বাবার কাছে বকা খেয়ে শেষপর্যন্ত বুকুন আমার দ্বারস্থ হল।

আমি বললাম,-ডিজিটাল ঘড়ি তৈরির একটা মতলব তোকে আমি বাতলে দিতে পারি, কিন্তু সেটা হাতে পরা যাবে না; দেওয়ালে টাঙাতে হবে।

এটা বানাতে যে পরিমাণ টাকা লাগবে সেটা শুনে বুকুন অবশ্য কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছিল, তবে পরে ঘড়ির গুণাগুণ শুনে বুকুনের পিতৃদেব রাজি হলেন টাকার যোগান দিতে।

তোমাদেরও হয়তো এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। সুতরাং আগেভাগেই বলে রাখি, এই ডিজিটাল ঘড়িটা তৈরি করতে প্রায় শ তিনেক টাকা খরচা হবে।

তাহলে এবার এটা বানাতে যা-যা লাগবে তাকানো যাক সেই লম্বা ফর্দটার দিকে।

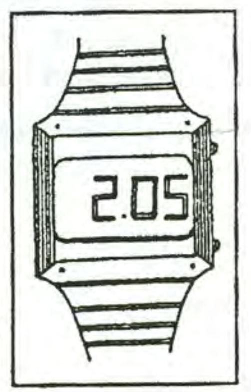

(১) আই. সি. M M 5369—একটা (আই. সি. বেস সহ)

(২) আই. সি. M M 5402—একটা (আই. সি. বেস সহ)

(৩) আই. সি. 555—একটা (আই. সি. বেস সহ)

(৪) কোয়ার্জ ক্রিস্টাল 3.579 MHZ—একটা

(৫) ট্রানজিস্টর BC 177—একটা

(৬) ট্রানজিস্টর 2N 2222—একটা

(৭) ট্রানজিস্টর BC 157—একটা

(৮) স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার (সেন্টার ট্যাপড) প্রাইমারি 220/230 ভোল্ট, সেকেন্ডারি 3 ভোল্ট এবং 9 ভোল্ট (500 মিলি অ্যামপিয়র)—একটা

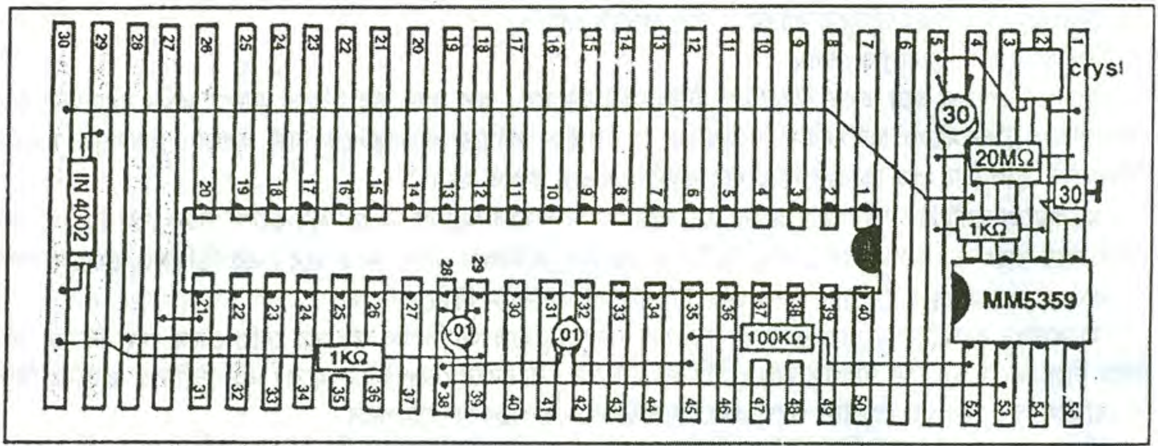

(৯) ৯ ভোল্টের ব্যাটারি—একটা

(১০) ক্যাপাসিটর 1000 mfd 15 V—দুটো

(১১) ক্যাপাসিটর 30 pf (মাইকা ক্যাপাসিটর)—একটা

(১২) ট্রিমার ক্যাপাসিটর 30 pf—একটা

(১৩) ক্যাপাসিটর 100 mfd 25 V—একটা

(১৪) ক্যাপাসিটর 0.01 mfd—চারটে

(১৫) ক্যাপাসিটর 0.02 mfd—একটা

(১৬) ডায়োড IN 4002—পাঁচটা

(১৭) LED—তিনটে

(১৮) স্পিকার 0.5 W, 8 Ω)—একটা

(১৯) রেজিস্টর (\f(1,4) W) 1K Ω—দুটো

(২০) রেজিস্টর (1.4) W) 20M Ω—একটা

(২১) রেজিস্টর (1.4W) 100K Ω—চারটা

(২২) রেজিস্টর (1.4W) 4.7K Ω—ছ'টা

(২৩) রেজিস্টর (1.4W) 22K Ω—একটা

(২৪) রেজিস্টর (1.4W) 150 Ω—একটা

(২৫) রেজিস্টর (1.4W) 27 Ω—একটা

(২৬) সেভেন সেগমেন্ট LED ডিসপ্লে (কমন ক্যাথোড) END-500—চারটে

(২৭) বড় আই. সি. বোর্ড–তিনটে

(২৮) টেপা সুইচ–পাঁচটা

এবার কাজ শুরু করা যাক!

আমাদের কাজের সুবিধের জন্য আমরা পাঁচটা আলাদা-আলাদা বোর্ড তৈরি করব।

(১) ১ নম্বর বোর্ডে প্রধান আই. সি.-টা বসানো থাকবে। (MM 5402 MM 5369 এবং আনুষঙ্গিক কিছু ছোট-ছোট কম্পোনেন্ট)

(২) ২ নম্বর বোর্ডে চারটে সেভেন সেগমেন্ট LED ডিসপ্লে (কমন ক্যাথোড) এবং তিনটে LED ডিসপ্লে (কমন ক্যাথোড) এবং তিনটে LED বসানো থাকবে। এটাই হল ডিসপ্লে বোর্ড।

(৩) ৩ নম্বর বোর্ডে অ্যালার্ম বাজার সার্কিটটি তৈরি হবে। (এখানে থাকবে I.C. 555, 2N 2222, BC 157, BC 177

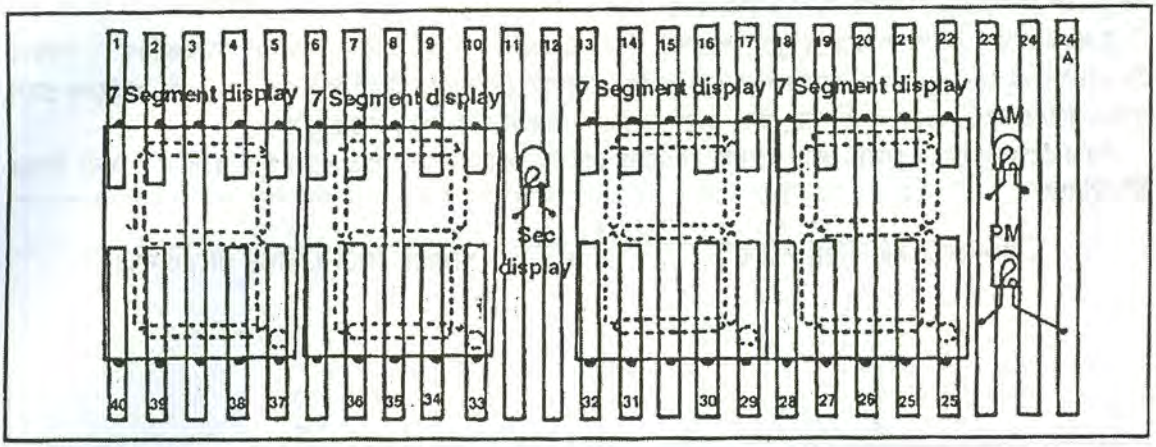

এবং অন্যান্য ছোট-ছোট কিছু কম্পোনেনট)

(৪) ৪ নম্বর বোর্ডটা হল পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড। এখানে চারটে ডায়োড, দুটো ক্যাপসিটর থাকবে।

(৫) ৫ নম্বর বোর্ডে থাকবে পাঁচটা টেপা সুইচ।

প্রথমেই ১ নম্বর বোর্ড নাও। ছবির দিকে তাকাও। প্রথমেই ঠিক যেভাবে দেখানো আছে সেভাবে MM 5402 এবং MM 5369-এর বেসদুটোকে বসিয়ে নাও। আর তোমরা তো জানোই আই. সি. বসাতে গেলেই বোর্ডের নিচের দিকের তামার পাতগুলোকে কীভাবে কেটে দিতে হয়; ছবিতেও সেটা দেখিয়েছি। এটা কিন্তু খেয়াল রেখো। আর তামার পাতগুলোকে যেহেতু কেটে দেওয়া হয়েছে তাই কিছু-কিছু তামার পাতের পাতের বাঁ-দিক এবং ডানদিক উভয় দিকেই নম্বর নেওয়া হয়েছে। এবার ছবি দেখে-দেখে নিশ্চয়ই অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো বসিয়ে নিতে কোনও অসুবিধে হবে না;

এবার দু-নম্বর বোর্ডটা তৈরি করা যাক!

একটা বড় বোর্ডে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেগুলো যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে বসিয়ে নাও। এগুলো বসাবার জন্য কোনও বেস-এর প্রয়োজন নেই। LED গুলোও অ্যানোড-ক্যাথোড দেখে নিয়ে বসাবে। 11 এবং 23 নম্বর তামার পাতে LED-এর ক্যাথোড সংযুক্ত হবে –এটা খেয়াল রেখো।

এখানেও কোনও-কোনও তামার পাতের সংযোগ কাটা দরকার; ছবিতে ব্যাপারটা দেখে নাও।

প্রতিটি সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেরই দুপাশে পাঁচটা-পাঁচটা করে পিন রয়েছে; দুপাশেরই মাঝের পিনটা হল কমন ক্যাথোড; সেই জন্যেই 3, 8, 15, 20 এই চারটে তামার পাত অক্ষতই রয়েছে। এবার এই বোর্ডের সবকটা LED এবং সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লের ক্যাথোড পয়েন্ট সরাসরি তার দিয়ে সংযোগ করে দেওয়া যাক। (ছবিতে দেখানো হয়েছে।)

আর-একটা যে বড় আই. সি. বোর্ড পড়ে আছে সেটাকে কেটে দু-টুকরো করে নাও। তারই একটা টুকরোয় পাওয়ায় সাপ্লাই এবং আর-একটা টুকরোয় অ্যালার্ম সার্কিটটা তৈরি করবে।

প্রথমেই অ্যালার্ম সার্কিটটা তৈরি করা যাক।

ছবিতে দেখিয়েছি ৫৫৫ নম্বর I.C.-র বেস, এবং অন্যান্য ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটর এবং রেজিস্টর কীভাবে বসবে। তোমরা ইচ্ছে করলে এই অ্যালার্ম সার্কিটের বদলে অন্য কোনও অ্যালার্মের সার্কিটও ব্যবহার করতে পারো।

এবার পাওয়ার বোর্ড।

এখানে থাকবে চারটে ডায়োড এবং দুটো কন্ডেন্সার। এটা তৈরি করা খুবই সোজা।

এবার একটা সাধারণ প্লাস্টিক বা ব্যাকেলাইট বোর্ডে ছোট-ছোট পাঁচটা গর্ত করে পাঁচটা টেপা-সুইচ লাগিয়ে নিতে হবে। এই সুইচগুলো তোমার ডিজিটাল ঘড়িকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। যেমন ধরো-ঘড়ির সময়কে এগিয়ে দেওয়া, অ্যালার্মের সময় ঠিক করা, অ্যালার্ম বাজা বন্ধ করা, সেকেন্ডের হিসেব দেখা ইত্যাদি।

কাজ এতক্ষণে যা হল, বাকি রয়েছে কিন্তু তার চেয়েও বেশি কাজ। এবার এই পাঁচটা আলাদা-আলাদা বোর্ডের

বিভিন্ন অংশ সরাসরি তার দিয়ে যোগ করতে হবে।

ট্রান্সফরমারের একপাশে রয়েছে দুটো পয়েন্ট, 220/230 ভোল্ট এ. সি.-র জন্য এবং একটা মধ্যবিন্দু বা সেন্টার ট্যাপ। ট্রান্সফরমারের 6 এবং 7 পয়েন্ট লম্বা তার লাগিয়ে অবশ্যই সে তারের অপর প্রান্ত বাড়ির এ. সি. লাইনের প্লাগে সংযোগ করতে হবে। তবে এখুনি নয়; তার আগে আরও কয়েকটা কাজ করে নিতে হবে।

এবার ট্রান্সফরমারের কোন-কোন পয়েন্ট পাওয়ার বোর্ডের কোন-কোন পাতে এসে যুক্ত হবে তার জন্য নিচের চার্টটা দেখো।

ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন পয়েন্ট	পাওয়ার বোর্ডের বিভিন্ন পাতের নম্বর
1	1
2	2
3	5
4	3
5	4

চার্টটা বুঝতে পারছ তো? ট্রান্সফরমারের 1 নম্বর পয়েন্ট আর পাওয়ার বোর্ডের 1 নম্বর পাত সরাসরি তার দিয়ে যুক্ত করতে হবে। ট্রান্সফরমারের 5 নম্বর পয়েন্ট আর পাওয়ার বোর্ডের 4 নম্বর পাত সরাসরি তার দিয়ে যুক্ত করতে হবে। এইরকমভাবে বাকি পয়েন্টগুলোও যোগ করতে হবে।

এবার পাওয়ার বোর্ডের কয়েকটি পাতকে সরাসরি 1 নম্বর বোর্ডের কয়েকটি পাতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। নিচের চার্ট দেখো।

পাওয়ার বোর্ডের বিভিন্ন পাতের নম্বর	1 নং বোর্ডের বিভিন্ন পাতের নম্বর
7	30
10	38
6	33

এবার এক নম্বর বোর্ডের অনেকগুলো পাতকে সরাসরি ডিসপ্লে বোর্ডের বিভিন্ন পাতের সঙ্গে যোগ করা দরকার। সেই সংযোগগুলো নিচের চার্টে দেখানো হল।

1 নং বোর্ডের বিভিন্ন পাতের নম্বর	ডিসপ্লে বোর্ডের বিভিন্ন পাতের নম্বর
50	24A
7	24
8	5 এবং 38
9	7
10	8
11	9
12	10
13	35
14	34
15	36
16	14
17	13

মডেল–১৩ নাচে আলো, নাচে ও ভাই ...

প্রায় দিন পনেরো বাদে বুকুনদের বাড়ি গিয়ে দেখি ওর পড়ার টেবিলের পাশে চমৎকার সুদৃশ্য বাক্সের মধ্যে ঢুকেছে ওই তিন ট্রানজিস্টার লোক্যাল সেটটা। বাক্সর গায়ে ফুটো-ফুটো করে রেডিওটা চালানো বন্ধ করার জন্য একটা খুদে সুইচও লাগিয়েছে শ্রীমান বুকুন।

এসব দেখে-শুনে 'বাঃ' বলা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

হাত বাড়িয়ে খুট করে রেডিওটা চালাই।

রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে 'আলো আমার আলো ওগো ...'

এই গানের মধ্যে একটা লাইন আছে-নাচে আলো নাচে ও ভাই হৃদয় বীণার মাঝে। বুকুনের ভারি আপত্তি ওই লাইনটায়। ও বলে, –আলো আবার নাচে নাকি?

বললুম,–এ আলোর নাচন তো চোখে দেখার নয়, মনের মধ্যে অনুভব করার।

–ও-সব আমি বুঝি নে। তুমি আমায় দেখাতে পারো যে আলো নাচছে?

–কেন? পুজোর সময় দেখিসনি আলোর নাচানাচি?

–তা দেখেছি; সেদিন তো সার্কাসের প্যান্ডেলেও দেখলুম।

আবার কি সার্কাসে যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছে নাকি? –বলতে-বলতে ভাবি ঘরে ঢুকলেন। হাতে মুড়ির বাটি তার মধ্যে তাজা তাজা সিঙাড়ারা উঁকি মারছে।

না-মা!-বুকুন লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ করে ঃ আমি ভাবছিলুম যে বুকনকে এমন একটা আলোর সেট বানিয়ে দেব যেটা ওর রেডিওর বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে নাচবে।

বেশ, তোমরা আবার মডেল নিয়ে বোসো, আমি রান্নাঘরে যাই। –ভাবি দরজার দিকে এগোন ঃ আর হ্যাঁ! সিঙাড়া কিন্তু ভাজা চলছে। খেয়াল রেখো।

নিশ্চয়ই। সে আর বলতে। ফুরোলেই পাঠাচ্ছি শ্রীমানকে। তারপর এক কাপ কফি পাঠাতে কিন্তু ভুলবেন না। আমি ফরমায়েস জানিয়ে রাখি।

এক কাপ নয় দু কাপ। আমিও খাব। –বুকুন চেঁচিয়ে ওঠে।

পাঠাচ্ছি, বাবা পাঠাচ্ছি। –ভাবির পায়ের শব্দ রান্নাঘরের দিকে মিলিয়ে যায়।

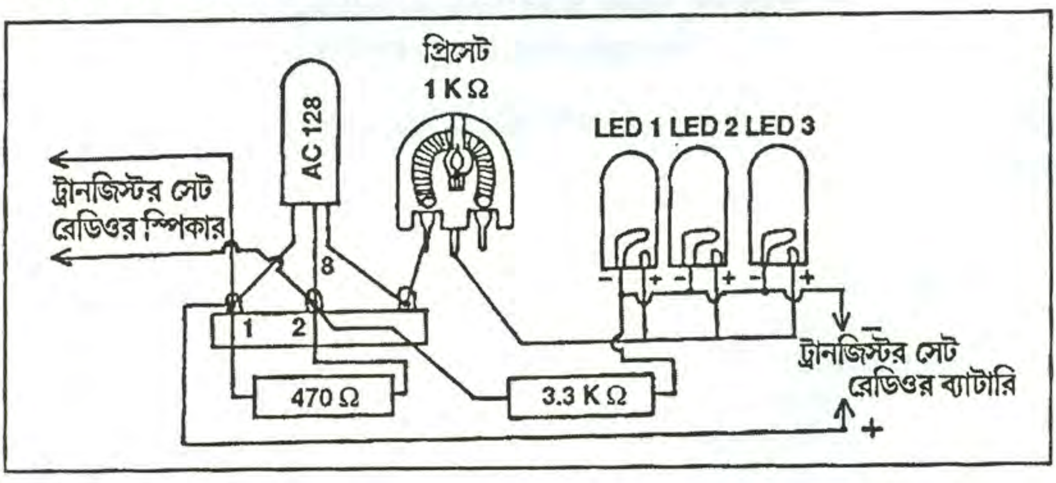

বুকুনকে বলি, –নে এই জিনিসগুলো জোগাড় কর; তোকে একটা নাচুনে আলো বানিয়ে দিই।

১। ট্রানজিস্টর ঃ AC 128 একটা;

২। রেজিস্টর ঃ 3.3K Ω একটা, 470 Ω একটা;

৩। প্রিসেট ঃ 1K Ω একটা;

৪। LED ঃ দু-তিনটে আলাদা আলাদা রঙের;

৫। ট্যাগ ঃ একটা 3-way।

ট্যাগটাকে প্রথমেই একটা ছোট্ট কাঠের টুকরোর ওপর আটকে নিতে হবে। তারপর তার তিনটে পয়েন্টকে তিনটে নম্বর দিয়ে দেওয়া যাক 1, 2 আর 3। AC 128 ট্রানজিস্টরটার কালেক্টর, বেস আর এমিটার পরপর লাগবে 3, 2 আর 1 নম্বর পয়েন্টে। 470 Ω রেজিস্টরটিও লাগবে 1 আর 2-এর মধ্যে।

এবার LED-এর পজিটিভ আর নেগেটিভ ঠ্যাঙগুলোকে একটু চিনে নিতে হবে। একটা দেড় ভোল্টের ব্যাটারির দু প্রান্ত থেকে দুটো তার এনে LED-র দুটো ঠ্যাঙ লাগানো যাক! যে ঠ্যাঙে পজিটিভ থেকে আসা তারটা ঠেকালে LED জ্বলবে সেটাই পজিটিভ, অন্যটা নেগেটিভ।

এবার কাজ হল তিনটে LED-রই নেগেটিভ ঠ্যাঙগুলো একসঙ্গে জুড়ে ফেলা। একইরকমভাবে পজিটিভ ঠ্যাঙগুলোও একসঙ্গে জুড়ে ফেলতে হবে।

নেগেটিভ ঠ্যাঙগুলো যেখানে জোড়া হয়েছে, সেখানে 3.3 K Ω রেজিস্টরের একটা প্রান্ত লাগাবে। রেজিস্টরের অন্য প্রান্তটা চলে যাবে 2 নম্বর পয়েন্টে। পজিটিভ ঠ্যাঙগুলো যেখানে জোড়া হয়েছে সেখান থেকে একটা তার এনে প্রিসেটটার মাঝের পয়েন্টে লাগানো হল। প্রিসেট-এর দু ধারের যে-কোনও একটা প্রান্ত থেকে একটা তার টেনে চলে এল ট্যাগের 3 নম্বর পয়েন্টে।

কাজ তো মোটামুটি শেষ।

এবার যে ট্রানজিস্টরের সঙ্গে এটা লাগানো হবে তার স্পিকার থেকে দুটো তার বের করে এনে লাগিয়ে দিতে হবে ট্যাগে 1 আর 2 নম্বর পয়েন্টে। ট্রানজিস্টরের ব্যাটারির নেগেটিভ আর পজেটিভ প্রান্ত থেকে দুটো তার বের করতে হবে। পজিটিভ প্রান্ত থেকে যে তারটা বেরিয়েছে সেটা যোগ হবে 1 নম্বর প্রান্ত আর নেগেটিভ থেকে যে তারটা বেরিয়েছে সেটা চলে যাবে LED-র নেগেটিভ ঠ্যাঙগুলো যেখানে জোড়া হয়েছে সেখানে।

ট্রানজিস্টরের সুইচ এবার ON করলেই বাজনার তালে-তালে LED-র আলোও কমবে-বাড়বে।

এই মডেলটা তৈরি করার পর শুনেছি, বুকুন নাকি রোজ রাত্তিরবেলা পড়াশোনা সেরে ঘরের আলো নিভিয়ে রেডিও চালিয়ে আলোর নাচ দেখত। এখন অবিশ্যি সে ব্যাপারটা একটু কমেছে।

মডেল–১৪

এলিমিনেটর

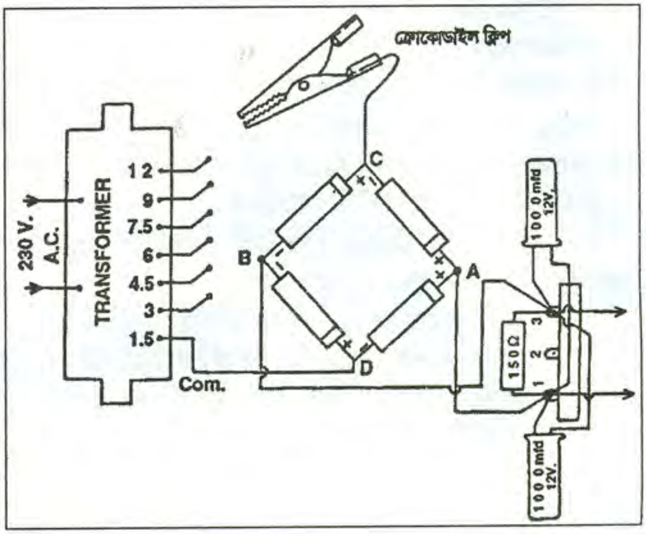

অনিমেষ দা'র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,–আর বোলো না ভাই; ব্যাটারির দাম যা বেড়েছে ও রেকর্ড প্লেয়ার বাজানোই বন্ধ করে দিয়েছি। আর আমার তো সেই পুরোনো দিনের রেকর্ড প্লেয়ার, ব্যাটারির বদলে যে মেন লাইনে চালাব তারও কোনও ব্যবস্থা ওর মধ্যে নেই।

আসলে অনিমেষ দা'র স্টকে পুরোনো ও নতুন দু-যুগেরই প্রচুর ভালো-ভালো রেকর্ড রয়েছে। সেদিন তার থেকেই বড়ে গুলামের একটা গজলের রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতে বলেছিলাম। তাতেই অনিমেষ দা'র এই খেদোক্তি।

অভয় দিই অনিমেষ দা'কে,–তা এজন্যে এত ভাবনার কী আছে? আমার শিষ্য শ্রীমান বুকুনকে কাজে লাগিয়ে দিন না। আমি বিকল্প পদ্ধতির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

–তা না হয় দিলুম। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থাটা কী হবে শুনি! এলিমিনেটর লাগাবে নাকি?

–ঠিক ধরেছেন। তবে আর দেরি কেন? এ তো বুকুনেরই দপ্তর। ওকে বাজারে পাঠান, আমি চটপট লিস্ট বানিয়ে দিচ্ছি।

১। স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ঃ [প্রাইমারি 230V AC, সেকেন্ডারি 1.5-12V AC' 600 mA একটা;

২। কন্ডেন্সার ঃ 1000 mfd 12V দুটো;

৩। রেজিস্টর ঃ 150 Ω, 1 Ω একটা;

৪। ডায়োড ঃ IN 4001 চারটে;

৫। ক্রোকোডাইল ক্লিপ ঃ একটা;

৬। ট্যাগ ঃ একটা 3-Way।

বাজার থেকে বুকুন ফিরল সবগুলো জিনিস নিয়েই, কেবল ট্রান্সফরমারটা সঙ্গে নেই।

–কিরে? আসল জিনিসটাই তো আনিসনি।

বুকুন বললে, –আনব কী? দোকানদার জিগ্যেস করলে Centre tapped ট্রান্সফরমার দেব? না অর্ডিনারি? আমি কী বলব?

বললাম,–তাইতো! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তুই একটা অর্ডিনারিই কিনে নিয়ে আয়।

–কিন্তু ওই Centre tapped ট্রান্সফরমারটা কী কাজে লাগে?

–ওটা দিয়েও কিন্তু ভালো এলিমিনেটর হয়। তোকে পরে শিখিয়ে দেব'খন। আপাতত একটা তো বানা!

সবগুলো জিনিস যখন হাতের কাছে পৌঁছল তখন কাজ শুরু করার পালা। প্রথম কাজ চারটে IN 4001 ডায়োড দিয়ে ছবির মতো ওই চারকোণা বস্তুটা তৈরি করা। একে বলে রেক্টিফায়ার। দুটো ডায়োডের পজেটিভ প্রান্ত প্রথমে জুড়ে নেওয়া গেল। এই পয়েন্টের নাম দিলাম A। অন্য ডায়োড দুটোর নেগোটিভ প্রান্ত দুটো জুড়ে দিয়ে নাম দিলাম B। এবার বাকি অংশটা ছবি দেখে করে ফেলা খুবই সহজ। তা হলে আমরা আরও দুটো পয়েন্ট পেলাম C আর D।

ট্রান্সফরমারটা দেখতে হবে খুব ভালো করে। এর একদিকে রয়েছে দুটো পয়েন্ট। অন্যদিকে আটটা পয়েন্ট যে দিকে কেবল দুটো পয়েন্ট রয়েছে, ওই দুটো পয়েন্ট একটু মোটা লম্বা তার লাগিয়ে সরাসরি মেন লাইনের প্লাগে যোগ করতে হবে। তবে প্লাগে লাগানোর আগে বাকি কাজগুলো করে নেওয়াই ভালো।

তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই এলিমিনেটর যাদের বাড়িতে AC লাইন আছে তারাই খালি ব্যবহার করতে পারবে।

ট্রান্সফরমারের যে দিকে আটটা কানেকশন পয়েন্ট রয়েছে সেগুলোকে ভালো করে চিনে নেওয়া দরকার। একটা পয়েন্টের গায়ে লেখা আছে 'C' বা 'Com' অর্থাৎ Common; অন্য পয়েন্টগুলোর গায়ে পর-পর লেখা রয়েছে 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 আর 12।

এবার ওই চারটে IN 4001 ডায়োড জুড়ে রেক্টিফায়ারটা হয়েছে, তার D প্রান্তটা যোগ হবে ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারির ওই 'কমন' লেখা পয়েন্টের সঙ্গে।

রেক্টিফায়ারের C পয়েন্ট থেকে একটা লম্বা তার বের করে তাদের অপর মাথায় একটা ক্রোকোডাইল ক্লিপ লাগিয়ে দেওয়া হল। যখন যে ভোল্টেজ দরকার ক্রোকোডাইল ক্লিপটা তখন সেই ভোল্টেজ লেখা পয়েন্টে আটকে দিলেই চলবে।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ট্রান্সফরমারটা একটা কাঠের টুকরোর ওপর স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে লাগিয়ে নিতে হবে; তার পাশে ওই ছোট্ট 3 way ট্যাগটাও।

ট্যাগের 1 আর 3 নম্বর পয়েন্টের মধ্যে দুটো 1000 mfd 12v কন্ডেন্সার লাগবে। আর লাগবে ওই 150 W, IW রেজিস্টরটাও। রেক্টিফায়ারের A আর B পয়েন্ট থেকে দুটো তার চলে আসবে যথাক্রমে 1 আর 3 নম্বর পয়েন্টে। ব্যস, কাজ শেষ।

শুধু ট্যাগের 1 নম্বরে একটা লাল তার আর 3 নম্বরে একটা কালো তার লাগিয়ে দেওয়া বাকি। লাল তারে পজিটিভ ভোল্টেজ আর কালো তারে নেগেটিভ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

এই এলিমিনেটর তৈরি হওয়ার পর অনিমেষ দা'র বাড়িতে পুরোনো গানের রেকর্ডগুলো মহানন্দে বাজাতে শুরু করি–একটার-পর-একটা। বুকুনও পছন্দ করে কতগুলো ছড়ার গানের রেকর্ড কিনেছিল; সেগুলোও দিব্যি শোনা গেল!

মডেল–১৫

মিনি গিজার

জানুয়ারি মাসের শীত। বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে।

রোজ সকালে তাই স্নান করা নিয়ে বুকুনের সঙ্গে মায়ের চেঁচামেচি, হইচই একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চৌবাচ্চার জমা পানি বড় ঠাণ্ডা; তাতে স্নান করতে বুকুন একেবারেই নারাজ; এদিকে স্কুলেরও দেরি হয়ে যায়। তাই দু মগ জল মাথায় ঢালা হল কি হল না, তার আগেই বুকুন ছুট লাগায় ঘরের মধ্যে; তোয়ালে দিয়ে ঝটপট গা হাত মুছতে থাকে।

শীতকালে সকালবেলা স্নান করতে গিয়ে তোমাদের সকলেরই বোধহয় এ সমস্যাটার মুখোমুখি হতে হয়।

তা হলে এক কাজ করো না, একটা ছোট হিটার তৈরি করে নেওয়া যাক, যেটার সাহায্যে স্নানের আগে এক বালতি জলকে গরম করে নেওয়া যাবে; খুব সহজেই।

খুব সাধারণ জিনিসপত্র দিয়েই এটা তৈরি হয়ে যাবে। যা যা লাগবে তা হল–

১। 2 ভাগের 1.2 ইঞ্চি লম্বা আর 1.2 ইঞ্চি চওড়া দুটো তামার পাত।

২। 2 ইঞ্চি লম্বা, .2 ইঞ্চি চওড়া, 1.2 ইঞ্চি মোটা একটা অ্যাবোনাইটের পাত।

৩। 1.4 ইঞ্চি স্ক্রু চারটে।

৪। ইলেকট্রিকের লাইন টানার তার।

৫। একটা প্লাগ টপ।

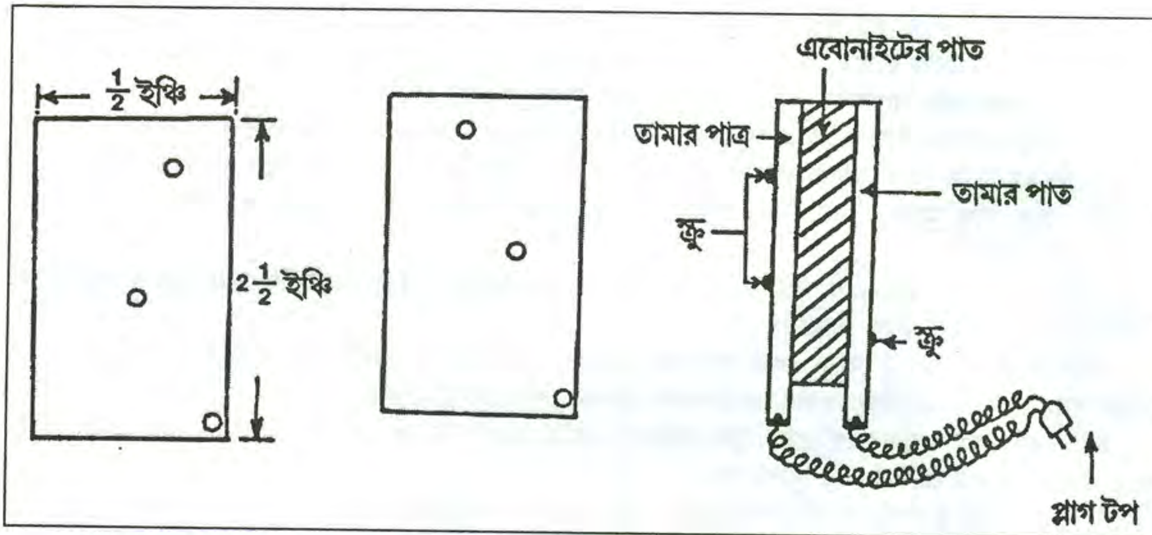

প্রথমেই তামার পাত দুটোতে ছোট-ছোট দুটো-ফুটো করে নেওয়া যাক; তবে খেয়াল রাখতে হবে দুটো পাতের ফুটো যেন একই জায়গায় না হয়; কারণ তাতে করে যখন স্ক্রু আঁটবে তখন স্ক্রু দুটো পরস্পরের সঙ্গে লেগে গিয়ে বৈদ্যুতিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে। এবার পাত দুটোর নিচের কোণার দিকেও দুটো ফুটো করে নাও।

অ্যাবোনাইটের পাতের দু পাশে এবার তামার পাত দুটোকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেওয়ার পালা।

কোণার দিকে যে দুটো ফুটো করা হয়েছে সেখানে দুটো তার ভালো করে লাগিয়ে তারের অপর প্রান্ত দুটো প্লাগ টপের দু-প্রান্তে লাগিয়ে দিলেই কাজ শেষ।

এবার একটা প্লাস্টিকের বালতিতে জল নিয়ে তার মধ্যে এই যন্ত্রটিকে ডুবিয়ে দাও; আর প্লাগটিকে লাগিয়ে দাও মেন লাইনে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। তারপর প্লাগ খুলে নাও। এবার জলে হাত দিয়ে দেখো জল বেশ গরম হয়ে উঠেছে। এবার আরামে স্নান করার পালা।

কিন্তু এখানে দুটো কথা সবসময় খেয়াল রাখবে। এখানে 240 ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করছ; সুতরাং–

১। প্লাস্টিকের বালতি ছাড়া কখনওই অন্য কোনও বালতি ব্যবহার করবে না।

২। প্লাগ যতক্ষণ মেন লাইনে যোগ করা আছে ততক্ষণ জলে হাত দেবে না; তাতে প্রচণ্ড শক লাগবে।

অল্প জল যদি গরম করতে চাও তাহলে কাচের বা প্লাস্টিকের গ্লাস, কাপ এসব ব্যবহার করতে পারো; কখনওই ধাতুর কোনও পাত্র ব্যবহার করবে না।

মডেল–১৬ ক্যালিডোস্কোপ

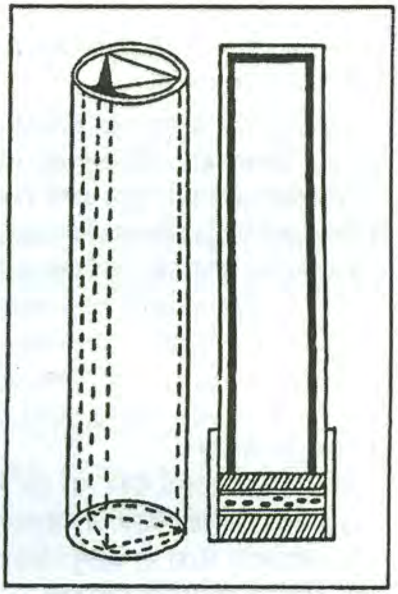

আয়নাটা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে পাশের বাড়ির বন্ধুর চোখে ফেলার চেষ্টা করছিল বুকুন। বোধহয় একটু অসাবধান হতেই আয়নাটা সশব্দে মাটিতে পড়ে বেশ কয়েক টুকরোয় পরিণত হল।

পাশের ঘরে আমি আর অনিমেষ দা ছুটির দিনের দ্বিপ্রাহরিক আড্ডা দিচ্ছিলাম; আয়না ভাঙার শব্দ কানে যেতেই অনিমেষ দা প্রায় মারমুখো হয়ে ছুটে এলেন, পাশের ঘরে ঃ ভাঙলি তো! আস্ত ছিল আয়নাখানা, গা কি কামড়াচ্ছিল? ফের যদি ....

বুকুনের অবস্থা প্রায় কাঁদ-কাঁদ; ওর হয়ে আমিই বললাম,–ওরকম মাঝেমধ্যে হয়েই থাকে; ও কি ইচ্ছে করে করেছে নাকি?

অনিমেষ দা'র ইচ্ছে ছিল বুকুনের গালে খানকয়েক চপেটাঘাত বর্ষণ করা; শেষপর্যন্ত আমার হস্তক্ষেপে তা আর বাস্তবায়িত হল না। বরং ভাঙা আয়নার টুকরোগুলো দিয়ে বুকুনকে একটা মজাদার জিনসই বানিয়ে দেওয়া হল।

বুকুনকে বললাম,–যা, কাচের দোকান থেকে এই ভাঙা আয়নাটা থেকে তিনটে সমান সাইজের আয়তাকার টুকরো কাটিয়ে নিয়ে আয়।

তবে একটা কথা গোড়ায় বলে নেওয়া ভালো, নইলে আমারই মুশকিলে পড়ার সম্ভাবনা। তোমরা যারা এ মডেলটা বানাবে, তাদেরকে অবশ্য বাড়ির আস্ত আয়নাটাকে ভাঙার দরকার নেই; কাচের দোকানে খোঁজ করলেই ছোট-ছোট আয়নার টুকরো পেয়ে যাবে। তবে তিনটে আয়নার টুকরো একই মাপের হওয়া চাই। তাহলে এটা তৈরি করতে যা-যা লাগবে তা হল–

১। তিনটে একই সাইজের আয়তাকৃতি আয়না;

২। একটুখানি ট্রেসিং পেপার;

৩। একটা শক্ত কাগজের লম্বা, গোল প্যাকেট;

৪। রঙিন কাচ বা চুড়ি ভাঙা।

শক্ত কাগজের লম্বা, গোল যে প্যাকেটটার কথা বললাম, ওটার কাজ একটা সুবিধেমতো ধূপের প্যাকেট দিয়েও চালিয়ে নিতে পারো।

আয়নার টুকরো তিনটে দিয়ে একটা ত্রিভুজের মতো চেহারা বানিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে ওই প্যাকেটটার মধ্যে। তবে খেয়াল রাখতে হবে আয়নার চকচকে দিকগুলো যেন ত্রিভুজের ভেতরের দিকে থাকে; আর ওগুলো যেন প্যাকেটের মধ্যে নড়াচড়া না করে।

প্যাকেটের নিচের দিকটায় পাতলা ট্রেসিং পেপার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে; তার ওপর ছোট-ছোট রঙিন চুড়ি বা কাচ ভাঙা ফেলে দাও।

প্যাকেটের মুখটা একটা শক্ত কাগজ দিয়ে আটকে দাও। তাতে একটা বড়সড় ফুটো করে দাও। এবার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে প্যাকেটের পেছন দিকটা আলোর দিকে করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাজার মজার রকমারি নকশা দেখো।

চুপি-চুপি বলে রাখি, বিশ্বস্ত বুকুন-সূত্রে খবর পেয়েছি, এটা তৈরি হওয়ার পরে তার পিতৃদেব, মানে আমার অনিমেষ দা মানে বুকুনের বাবাও নাকি এতে চোখ লাগিয়ে আয়না ভাঙার শোক কিছুটা অন্তত ভুলেছিলেন!

মডেল–১৭

পানি মাপার সহজ কল

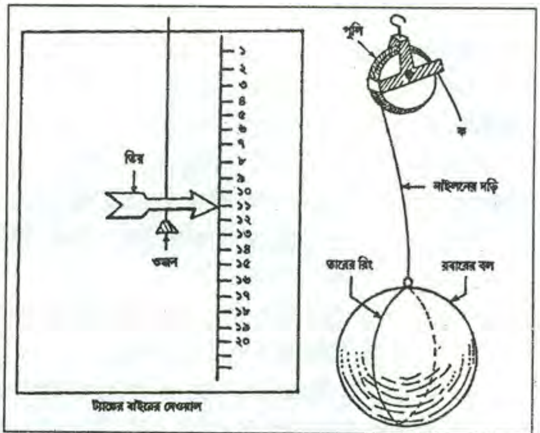

সেটা ছিল ছুটির দিন; তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি, তার আগেই শ্রীমান বুকুনের হন্তদন্ত আবির্ভাব।

জিগ্যেস,–দূর, বাড়ি তো নয়, কুরুক্ষেত্র।

বললাম,–কী হল আবার?

পানি-কেলেংকারি!–বুকুনের ছোট উত্তর।

উত্তর শুনে বিস্মিত হই। প্রতিপ্রশ্ন করি,–সেটা আবার কী?

ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য বুকুন একটি বিরাট লেকচার দিয়ে বসল, যার মর্মার্থ হল এই যে-আগের দিন রাত্রে পাম্প চালিয়ে ওপরের ট্যাঙ্কে পানি তুলে রাখা হয়নি, ফলে পরের দিন সকালে পানির জন্য ভাড়াটেরা তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করেছেন। তার ওপর তখন চলছে লোডশেডিং; তড়িঘড়ি পাম্প চালিয়ে যে কিছুটা পানি ওপরে তুলে দেওয়া হবে তারও কোনও উপায় নেই।

বুকুন জানতে চায়,–আচ্ছা, এমন কোনও ব্যবস্থা করা যায় না যাতে বাইরে থেকেই সহজে বোঝা যাবে ট্যাঙ্কে কতটা কতটা আছে?

বললাম,–কেন করা যাবে না? খুব সহজ। খুব সাধারণ জিনিসপত্র দিয়েই এটা তৈরি হয়ে যাবে। যেমন ধর–

১। একটা মাঝারি আকারের রবারের বল।

২। খানিকটা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তার।

৩। কিছুটা নাইলনের সরু দড়ি।

৪। একটা কাঠের পুলি (কাটিম হলেও চলতে পারে)

৫। এক টুকরো পাতলা কাঠ (তিরের আকৃতিতে কাটা)

তোমরা যদি তোমাদের বাড়ির উঁচু ট্যাঙ্কে জমা পানির পরিমাণ বাইরে থেকে মাপতে চাও তাহলে তোমরাও এ জিনিসগুলো সংগ্রহ করে নাও।

প্রথম কাজ হল, ওই তারটা দিয়ে রবারের বলটার উপযুক্ত একটা রিং তৈরি করা, ওই রিঙের মধ্যে বলটা ঠিকমতো আটকে থাকা চাই, যেন বেরিয়ে না যায়। রিঙের মাথায় দড়ি বাঁধার জন্য একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এবার রিঙের মাথায় দড়িটাকে বেঁধে পুলির ওপর দিয়ে এনে তীরের মতো করে কাটা পাতলা কাঠের যে টুকরোটা আছে তার সঙ্গে আটকে দিতে হবে।

কাঠের টুকরোটার গায়ে একটু বাড়তি ওজন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

এটা তোমাকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। রিংসমেত বল এবং দড়ির ওজন ওই কাঠের তিরের ওজনের সমান হওয়া চাই।

ট্যাঙ্ক থেকে ফুটখানেক উঁচুতে পুলিটা লাগানোর ব্যবস্থা করো। ট্যাঙ্কের মধ্যে নামবার জন্য নিশ্চয়ই একটা ঢাকা দেওয়া পথ আছে; সেই ঢাকাটা তুলে রিং সমেত বলটা ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। বলটা যেন পানির ওপর ভেসে থাকে। তিরটা থাকবে বাইরে, ট্যাঙ্কের গায়ে। ট্যাঙ্কের গায়ে একটা লম্বালম্বি রেখা টেনে নাও; সেখানেই পানির বিভিন্ন উচ্চতাজ্ঞাপক সংখ্যা লিখে রাখো।

যন্ত্রটাকে কাজ করানোর আগে তোমার একবার কষ্ট করে মেপে নিতে হবে ট্যাঙ্কে কতটা পানি আছে।

মনে করা যাক 10 ইঞ্চি পানি রয়েছে। তা হলে ট্যাঙ্কের বাইরে এখন যেখানে তিরটা রয়েছে সেটাই 10 ইঞ্চির স্থান। এবার সেখান থেকে ওপরের দিকে ইঞ্চি মেপে পরপর 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 লিখে যাও। নিচের দিকেও 11, 12, 13, 14 ... এইভাবে লিখে যাও।

যন্ত্র তৈরি শেষ। এবার ট্যাঙ্কে যতই পানি বাড়বে বা কমবে ততটা ভেসে-ভেসে ওপরে উঠবে বা নামবে। বাইরের তিরটাও সেইসঙ্গে ধীরে-ধীরে নিচে নামবে বা ওপরে উঠবে। তুমিও বাইরে থেকে দেখেই পানির উচ্চতা বুঝতে পারবে।

আমি নিঃসন্দেহ, এ যন্ত্র তৈরি হওয়ার পর বুকুনদের বাড়িতে মাঝে-মাঝেই সবাই যে নির্জলাতঙ্ক রোগে ভুগত, সেটা সেরে গেছে।

মডেল–১৮ ডি. সি. এলিমিনেটর

–কী গ্যাঁড়াকলে পড়েছি জানো তো? আমার এক বন্ধু আমায় একটা এলিমিনেটর বানিয়ে দিতে বলেছিল। দিলাম। কিন্তু আমি কী জানি ছাই যে ওদের বাড়িতে ডি. সি. সাপ্লাই? আমার তৈরি এলিমিনেটরটা নিয়ে গিয়ে যেই না ওদের বাড়িতে লাগানো, অমনি ভুস–স!

–ভুস মানে? ট্রান্সফরমারটা পুড়ল তো!

–আরে! সে কথা তুমি জানলে কী করে?

কথা হচ্ছিল আমার সঙ্গে বুকুনের। বুকুনের অবাক হওয়া ভাব দেখে বললাম,–ট্রান্সফরমার কি ডি. সি. লাইনে লাগানো যায়? ডি. সি. ভোল্টেজ এলিমিনেটর তৈরির আলাদা পদ্ধতি আছে। আমি তোকে খুব সোজা একটা পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছি।

এটা তৈরি করতে দুটো জিনিস লাগবে ঃ

১। 8.2 K Ω, 10 Watt রেজিস্টর–একটা

২। 6 V, 1 Watt জেনার ডায়োড-একটা

এবার জেনার ডায়োডের পজিটিভ প্রান্তটা লাগিয়ে দেওয়া যাক 8.2 K Ω রেজিস্টরের একটা প্রান্তে।

220 V DC লাইনের পজিটিভ প্রান্তের তারটা যোগ হবে 8.2 K Ω রেজিস্টরের অপর প্রান্তে; আর নেগেটিভ প্রান্তের তারটা যোগ হবে জেনার ডায়োডের ক্যাথোডে বা নেগেটিভ প্রান্তে। এই পজিটিভ, নেগেটিভ ব্যাপারটা যেন গোলমাল না হয়।

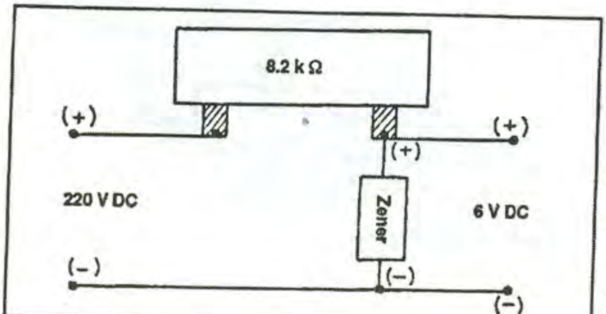

এবার জেনার ডায়োডের পজিটিভ প্রান্তে একটা লাল তার নেগেটিভ প্রান্তে একটা কালো বা নীল তার ঝালাই করে দিলেই কাজ শেষ। এখন এই দুটো তারই আমায় যোগান দেবে 6 ভোল্ট ডি. সি.।

এই পুরো ব্যবস্থাটাকে একটা উপযুক্ত-বাক্সের মধ্যে রাখতে হবে, নইলে 220 V DC লাইনে হাত লেগে বিপর্যয় ঘটতে পারে। তা ছাড়া, ওই 8.2 K Ω রেজিস্টরটা বেশ গরমও হবে; সুতরাং ওটাকে সাবধানে রাখাই ভালো।

কি, এবার এলিমিনেটর নিয়ে গণ্ডগোলের সমাপ্তি তো?

মডেল-১৯

রিচার্জেব্‌ল টর্চ

গ্রামের মেয়ে হয়েও অন্ধকারকে যে শ্যামার এত ভয় তা কে জানত?

আমি বুকুনের ছোট পিসির কথা বলছি। তাকে মনে আছে তো তোমাদের? বার্ষিক পরীক্ষার পরই ও এসেছে বুকুনদের বাড়িতে বেড়াতে। কিন্তু ঢাকার এই ফ্যাঁসাদের সঙ্গে শ্যামার বোধহয় ঠিক পরিচিত ছিল না। কথা নেই বার্তা নেই, সময় নেই, অসময় নেই যখন তখন হুট করে লোডশেডিং। ঝুপ করে অন্ধকার যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

দিনের বেলা লোডশেডিং-এ গরম ছাড়া আর খুব একটা অসুবিধে নেই; কিন্তু রাত্তিরে!

তখন তার অবস্থাটা কেমন হয় জানো? ঠিক ওই রবীন্দ্রনাথের হারিয়ে যাওয়া কবিতায় যেমনটি রয়েছে, ঠিক তেমন–

সিঁড়ির মধ্যে যেতে-যেতে
প্রদীপটা তার নিভে গেছে বাতাসেতে
শুধাই তারে, 'কি হয়েছে বামী?'
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, 'হারিয়ে গেছি আমি!'

বুকুন তো বলে, –লোডশেডিংটা এখন আমাদের বেশ সয়ে গেছে; এখন অন্ধকারেও আমরা বেশ দেখতে পাই। কিন্তু তা বললে কী হয়, শ্যামার অবস্থা বেশ করুণ। সন্ধে হল তো শ্যামার আঁচলের তলায় একখানা টর্চের সন্ধান পাওয়া যাবেই। কিন্তু টর্চের ব্যাটারির আয়ুই বা কদ্দিন, বলো! আর ব্যাটারির দামও তো নেহাত কম নয়।

সেদিন বুকুনের বাড়িতে নববর্ষের আসরে এই প্রসঙ্গটা উঠতেই বুকুনকে বললাম,–দেখ, বারবার ব্যাটারি না কিনেও টর্চ জ্বালাবার একটা কায়দা আমার জানা আছে।

বুকুন একটু মুচকি হাসলে। ভাবখানা, নতুন আর কী শোনাবে! বললে,–জানি, জানি, ওই ব্যাটারিগুলোকেই আবার চার্জ করে নিতে বলবে তো! তবে জেনে রাখো ড্রাই সেল বারবার চার্জ করা যায় না।

আমি বললাম,–অজ্ঞে না, সবজান্তা অপোগণ্ড। আমি এমন একটা ব্যাটারির কথা বলব যেটা সত্যিই রিচার্জেব্‌ল।

তাই নাকি!–শ্যামা বুকুন দুজনের চোখই এবার দুটাকার রাজভোগ। বললাম,–প্রথমে হয়তো এরকম একটা টর্চ বানাতে খরচা একটু বেশিই, তবে আখেরে কিন্তু লাভই হয়।

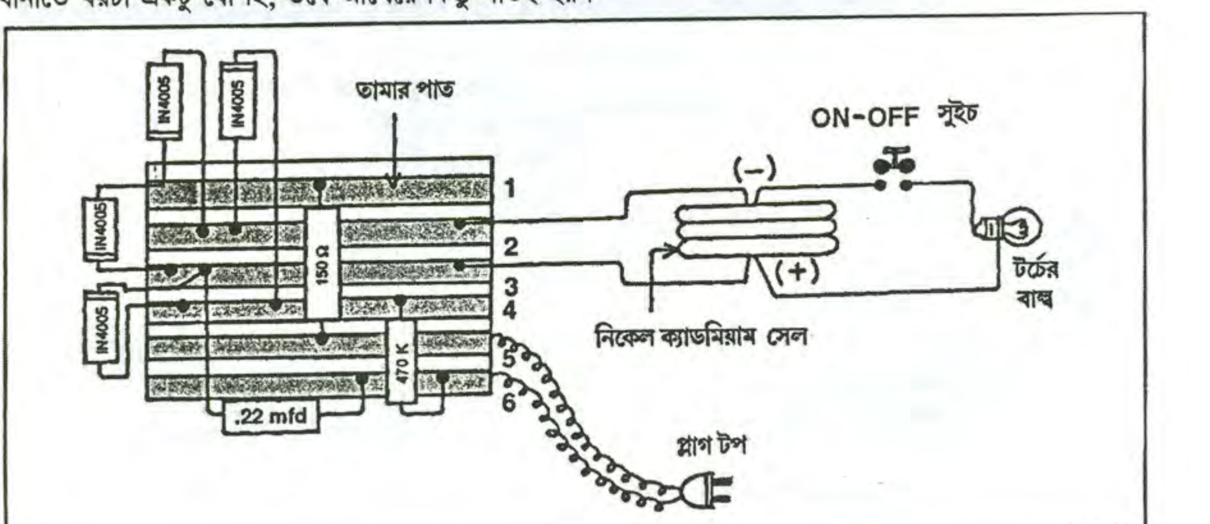

আর কোনও কথা না বলে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজের টুকরো টেনে নেয় বুকুন; তারপর নিঃশব্দে আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

জিগ্যেস করি,–ওটা কী হবে?

–লিস্টটা বানাও; জিনিসগুলো কিনতে হবে তো!

আমি জিনিসগুলোর নাম লিখতে থাকি কাগজের ওপর আর ওরা দুজন তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

১। রেজিস্টর 150 Ω 1/2 Watt-একটা

২। রেজিস্টর 470 K Ω, 1 Watt-একটা

৩। ক্যাপাসিটর 0.22 kfd, 400V-একটা

৪। ডায়োড IN 4005—চারটে

৫। Ni-Cd Button Cell (Rechargeable)—তিনটে (1.25V, 225 mAH)

৬। তিন ভোল্টে জ্বলে এরকম টুনিবাল্ব–একটা

৭। ছোট্ট ON-OFF সুইচ–একটা

৮। ছোট্ট সাধারণ ভেরোবোর্ড–একটা

ভেরোবোর্ডের তামার পাতগুলোয় যথারীতি নম্বর দিয়ে দেওয়া হল–1, 2, 3, 4, 5, 6।

এবার কোন-কোন পাতে কী-কী লাগানো হবে তার জন্য নিচের চার্টটা দেখা যাক।

Component-এর নাম	যে দুটি পাতে লাগানো হবে তাদের নম্বর	
IN 4005 diode	Positive-2	Negative-1
IN 4005 diode	Positive-1	Negative-3
IN 4005 diode	Positive-4	Negative-3
IN 4005 diode	Positive-2	Negative-4
150 Ω resistor	1	5
470 Ω resistor	4	6
0.22 mfd capacitor	4	6

এই পর্যন্ত করে ফেলতে পারলেই ভেরোবোর্ডের ওপর কাজ মোটামুটি শেষ।

এবার একটা সুবিধেজনক বাক্স যোগাড় করতে হবে যেটার মধ্যে টর্চটা তৈরি হবে। এ ব্যাপারে বুকুনই আমার চেয়ে বেশি এক্সপার্ট। সে-ই একটা ছোট্ট অথচ বেশ শক্তপোক্ত প্লাস্টিকের বাক্স জোগাড় করল। তোমরা মোটা কার্ডবোর্ডের বাক্সও ব্যবহার করতে পারো। তবে খেয়াল রেখো-ধাতুর তৈরি কোনও বাক্স কখনই ব্যবহার করা চলবে না।

বাক্সের এক কোণায় আবার ছোট্ট একফালি একটা ঘর তৈরি করা হল যেখানে ওই নিকেল-ক্যাডমিয়াম সেলগুলো রাখা হবে একটার ওপর আর-একটা।

মনে করো প্রথম সেলটার পজিটিভ দিকটা নিচের দিকে রাখা হল, এবার তার ওপর দ্বিতীয় সেলটার পজিটিভ দিকটা রাখো; তার ওপর তৃতীয় সেলটার পজিটিভ দিকটা রাখো। এবার তাহলে সবচেয়ে ওপরে রইল তৃতীয় সেলের নেগেটিভ দিকটা; তাইতো!

এবার প্রথম সেলের পজিটিভ প্রান্তে অর্থাৎ যে দিকটা সবচেয়ে ওপরে আছে সেখানেও দুটো তার লাগাও; এ দুটো তার নীল বা সবুজ রঙের লাগিও। অন্য রঙের তার লাগালেও অসুবিধে নেই; তবে পজিটিভ আর নেগেটিভ যাতে চটপট চেনা যায় তাই ওই রঙের তার লাগাতে বলছি।

এবার সেলের গায়ে যে নীল/সবুজ রঙের তার লাগানো হয়েছে তার একটা ঝালাই করে দাও ভেরোবোর্ডের দু-নম্বর তামার পাতে আর অন্য নীল/সবুজ তারটা ON-OFF সুইচের এক প্রান্তে। সুইচের অন্য প্রান্ত একটা তার দিয়ে যোগ করো টুনিবাল্বের যে-কোনও একটা প্রান্তের সঙ্গে।

সেলের গায়ে লাগানো লাল রঙের একটা তার ঝালাই করো ভেরোবোর্ডের 3 নম্বর তামার পাতে; অন্য লাল তারটা সরাসরি টুনি বাল্বের ফাঁকা পড়ে থাকা প্রান্তটাতে যোগ হবে।

এবার ভেরোবোর্ডের 5 আর 6 নম্বর পাতে একটা করে তার ঝালাই করো। তার দুটো লম্বা হওয়া চাই। তাদের অপর দুটো প্রান্ত একটা প্লাগটপে লাগিয়ে দাও। এই প্লাগটাই বাড়ির এ. সি. লাইনে লাগিয়ে সেলগুলোকে চার্জ করতে হবে।

এবার ওই প্লাস্টিকের বাক্সটার একপাশে সুইচটা বসানো হল। অন্যদিকে একটা ফোকাস সমেত টুনিবাল্বটাকে লাগানো হল। এর পরেও একটু কাজ অবশ্য বাকি রয়ে গেল-ফিনিশিং টাচ। সেটার দায়িত্ব পুরোপুরি বুকুন আর শ্যামার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া গেল।

শুধু সাবধান করে বললাম,-দেখিস বাপু,-ভেতরের সেল বা টুনিবাল্ব যেন ভেরোবোর্ডের গায়ে না লাগে; তার সার্কিটের কোনও অংশ যেন বাক্সের বাইরে বেরিয়ে না থাকে; কারণ সেলগুলো যখন চার্জ হবে তখন সার্কিটের কোনও অংশে হাত লাগা মোটেই নিরাপদ নয়।

টর্চটা যেমন রাত্তিরে জ্বালাবে, তেমনি ওর সেলগুলোকে কিন্তু দিনের বেলায় ওই প্লাগটাকে এ. সি. লাইনে লাগিয়ে চার্জ করতে হবে। চার্জ করার সময় তোমরা আরও-একটা জরুরি কথা খেয়াল রেখো, সেইসময় ON-OFF সুইচটা যেন OFF করা থাকে; আর সেসময় বাক্সের গায়েও কেউ হাত দিও না।

শুনেছি এ টর্চটা শ্যামার প্রয়োজনে বানানো হলেও ও চলে যাওয়ার পরে নাকি বুকুনের বাবাই ওটাকে সন্ধের পর পকেটে নিয়ে ঘুরতেন।

মডেল-২০ ইলেকট্রনিক অর্গ্যান

এবারের পূজোয় বুকুন তার মামারবাড়িতেই কাটাবে ঠিক করেছে। গ্রামের পূজো শহরের মতো জাঁকজমক হাঁক-ডাক নেই বলে প্রথমদিকে বুকুনের একটু অসন্তোষ ছিল বই কি। কিন্তু বীণা মামি কথা শুনে বুকুন তার মতো পালটেছে। বীণা মামি বলে ঃ সত্যিকারের পুজো যদি দেখতে চাস তো গ্রামেই তোকে যেতে হবে। সেখানে আদিগন্ত বিস্তৃত শরতের ধানক্ষেত, মাথার ওপর নীল আকাশের সামিয়ানা, দূরে কাশফুলের ঝাড়, মাথার ওপর শরতের মেঘের উঁকি-ঝুঁকি। শহরে তো কেবল কান ঝালাপালা করা মাইকের চিৎকার আর হাজার আলোর মালায় বিদ্যুতের অপচয়। গ্রামে অবশ্য একটাই পূজো কিন্তু সেই নিয়েই কী দারুণ মজা।

সুতরাং এবার পূজোয় মামারবাড়ির গ্রামই বুকুনের গন্তব্যস্থল। বুকুনের ইচ্ছে মামারবাড়ি যাওয়ার সময় বীণা মামির জন্য একটা উপহার নিয়ে যাবে।

আমি বললাম,-বেশ তো, ওকে একটা ইলেকট্রনিক অর্গান বানিয়ে দে না; বীণার তো একটু গান-বাজনারও শখ আছে বলে শুনেছি।

প্রস্তাবটা বুকুনের খুব পছন্দ হল। বললে,-তা হলে আর দেরি নয়, চটপট লিস্টটা বানিয়ে দাও।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকাটা বেশ লম্বাই হল ঃ

১। আই. সি. (I.C.) : 556—একটা

২। 556 I.C.-র base—একটা

৩। ট্রানজিস্টর ঃ 2N 2222—একটা
BC 157—একটা

৪। ক্যাপাসিটর ঃ 0.33 mfd—একটা
0.22 mfd—একটা
0.1 mfd—একটা
0.01 mfd—একটা
100 mfd 25V—একটা

৫। রেজিস্টর ঃ 27 Ω —একটা
IK Ω—একটা
330 K Ω—দুটো
10 K Ω—একটা
47 K Ω—একটা
(প্রত্যেকটাই 1.2ওয়াট)
৬। 2 ভাগের1.2 ইঞ্চি স্পিকার—একটা
৭। আই. সি. বোর্ড—একটা
৮। 9 ভোল্টের ব্যাটারি—একটা

পরের দিনই বুকুন মালপত্র নিয়ে হাজির। বললো–দেরি করে তো লাভ নেই। কাজ শুরু করে দিই। বেশ তবে তাই হোক।

প্রথমেই আই. সি-র বেসটাকে বোর্ডের ওপর বসিয়ে নেওয়া হল। বুকুনকে দেখালাম–দ্যাখ, এইভাবে আই, সি. বেস বসিয়ে তার ওপর যদি আই. সি.-টাকে লাগিয়ে দিস তা হলে আই. সি-র 1 নম্বর আর 14 নম্বর, 2 নম্বর আর 13 নম্বর, 3 নম্বর আর 12 নম্বর, 4 নম্বর আর 11 নম্বর, 5 নম্বর আর 10 নম্বর; 6 নম্বর আর 9 নম্বর, 7 নম্বর আর 8 (আট) নম্বর ঠ্যাগুলো তামার পাত দিয়ে যোগ হয়ে গেল। কিন্তু এরকমটা হলে তো চলবে না। তাই ওই সংযোগগুলো বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটা ছুরি দিয়ে ঘষে-ঘষে ওই জায়গার তামার পাতগুলো কিছুটা করে তুলে দেওয়া হল; যেমন আগেও করেছি।

এবার ওপর থেকে পরপর তামার পাতাগুলোকে কীভাবে নম্বর দেওয়া হল সেটা খেয়াল করতে হবে, ছবিতে সেটা দেখিয়ে দিয়েছি। যেহেতু ৭টা পাতকে ছুরি দিয়ে কেটে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে, তাই ওই পাতগুলোকে ডানদিকের আর বাঁ-দিকের অংশগুলোকে আলাদা-আলাদা করে নম্বর দেওয়া হল।

ছবি আর চার্ট মিলিয়ে এবার পরের কাজটা খুব সহজেই করে ফেলা যাবে।

Component-এর নাম	যে দুটি পাতে লাগানো হবে তাদের নম্বর	
আবরণ দেওয়া তার	7	11
আবরণ দেওয়া তার	4	10
আবরণ দেওয়া তার	12	15
আবরণ দেওয়া তার	9	16
আবরণ দেওয়া তার	16	20
আবরণ দেওয়া তার	18	22
আবরণ দেওয়া তার	3	13
আবরণ দেওয়া তার	4	14
0.01 mfd ক্যাপাসিটর	1	2
0.1 mfd ক্যাপাসিটর	19	15
0.33 mfd ক্যাপাসিটর	20	15
100 mfd 25V ক্যাপাসিটর	পজিটিভ—3	নেগেটিভ—2
0.22 mfd ক্যাপাসিটর	8 (আট)	15
0.22 mfd ক্যাপাসিটর	11	15
0.22 mfd ক্যাপাসিটর	22	15
I K Ω রেজিস্টর	6	9
47 Ω রেজিস্টর	17	20
10 Ω রেজিস্টর	21	15
27 Ω রেজিস্টর	1	15
330 Ω রেজিস্টর	8 (আট)	21
330 Ω রেজিস্টর	17	22
স্পিকার	2	15
ব্যাটারি (9 ভোল্ট)	নেগেটিভ—15	পজিটিভ—20

মডেল–০৯ প্রোজেক্টর

নিঃসঙ্গতা যখন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরে, মন তখন স্মৃতির পাখায় ভর করে উড়ে যেতে চায় দূরে আরও দূরে।... বসে আছি শান্ত, সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে, সোনা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে। ধুলো উড়িয়ে চলেছে ধানে বোঝাই গরুর গাড়ি-হেট-হেট। শান্ত নদীর বুকে পাল তুলে চলেছে নৌকো, ভেসে আসে আকাশ বাতাস জুড়ে অপরূপ ভাটিয়ালি গান।

অ্যালবামের পাতা ওলটাই।

মনে পড়ে যায়, দিগন্তবিসারী চিল্কার বুকে একচিলতে ওই পাথরটাকে।

যেদিকে তাকাই–শুধু পানি আর পানি। শহরের কোলাহল নেই। নেই আকাশচুম্বী অট্টালিকার সারি। উন্মুক্ত আকাশ, নিস্তব্ধ চরাচর। শরীরটা এলিয়ে দিই নীল জল আর আকাশি ওই আকাশের মাঝে।

পাশে আধশোয়া বন্ধুকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই–আচ্ছন্নতা ভাঙে। সম্বিত ফিরে পাই নিমেষে। মনে হয়, এ তো শুধুই ছবি, বইয়ে গাঁথা।

ছুটে যেতে চায় মন। ফিরে পেতে চাই ফেলে আসা সেই মুহূর্তগুলো। কিন্তু হায়, জীবনের ছবি তো আঁকা হয়ে গেছে অনেক দিন। দিবারাত্রি তুলি বোলানোই তো বাকি জীবনের কাজ। সব জেনেও মন মানে না-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় ওই ছবির মাঝে।

মনের টানে তৈরি করতে বসি এক ঘরোয়া প্রোজেক্টর।

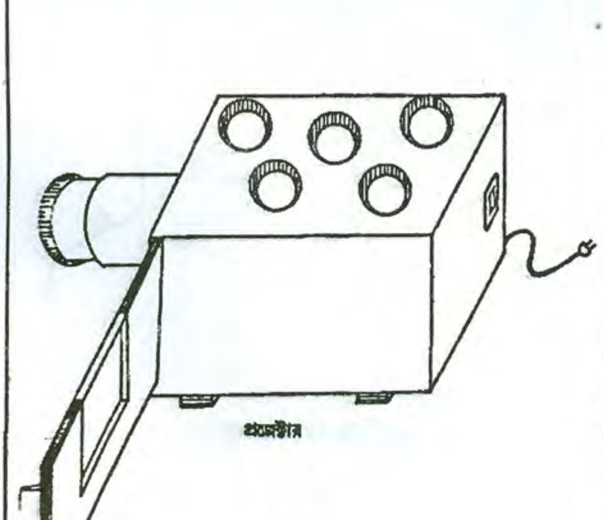

ছবি নং ১

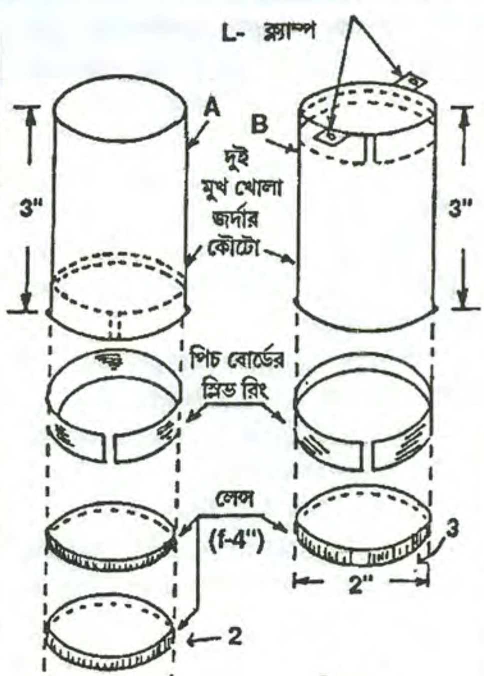

ছবি নং ২

জোগাড় করি তিনটে লেন্স (৪" ফোকাল লেন্সের ২" ব্যাসের)। আর ৩" সাইজের দুটো জর্দার কৌটো (ব্যাস ২ ভাগের ১.২ এদের একটার মধ্যে অন্যটাকে ঢোকানো যায় (ছবি নং ৩ ক)। দুটো কৌটোরই পিছনদিক কেটে দুমুখ খোলা

ফাঁপা চোঙের মতো করি। পিচবোর্ডের রিং তৈরি করে নিয়ে (ছবি নং ২) বাইরে কৌটোর এক প্রান্তে একটা ও অন্যটাতে দুটো লেন্স শক্ত করে বসিয়ে দিই।

এইবার বাইরের কৌটোর দুইপ্রান্তে দুটো Lআকৃতির লোহার ক্ল্যাম্প ঠিক ব্যাস বরাবর নাটবোল্ট দিয়ে লাগাই।

প্লাইউড দিয়ে প্রোজেক্টরের খোলটা মাপসই করে তৈরি করে নিই (ছবি নং ৩ক)। প্রয়োজনে অ্যালুমিনিয়ামেরই করা যেতে পারে। ওই খোলটার পিছনের দেওয়ালে লাগাই একশো ওয়াটের ঘরে ব্যবহারের সাদা ল্যাম্প, অফ-অন সুইচ। ল্যাম্পের তার মেন-এ দিই মাঝে সুইচ ঘুরিয়ে (ছবি ৩ খ)।

ওপরের ঢাকনাটা লাগাই কব্জা দিয়ে। তাতে থাকবে ৪-৫টা গর্ত। তাপ বেরোনোর জন্যে।

৪ক, ৪খ, ৪গ ছবির মতো করে স্লাইড মুভারটা তৈরি করে নিই।

দুটো 'U' আকৃতির স্লাইডারকে (৩ক নং ছবি) কাজে লাগাই স্লাইড মুভারে রাখা স্লাইডকে পালটাতে।

প্রোজেক্টরের সামনে L লাগানো কৌটো যত্ন করে জায়গামতো লাগাই এবং গায়ে লাগানো L ক্ল্যাম্প প্রোজেক্টরের গায়ে নাটবোল্ট দিয়ে (ছবি ৩ ক) বসিয়ে দিই বেশ শক্ত করে, যাতে সহজে না নড়ে।

এখন ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলে আলো স্লাইডের মধ্যে দিয়ে লেন্স হয়ে পরদায় পড়বে, ফলে স্লাইডের ছবি বড় হয়ে দেখা যাবে পরদায়।

প্রোজেক্টর রেডি (ছবি নং ৫-এর মতো)...

স্লাইডারে মধ্যে ভরে দিই পুরোনো স্লাইড-ফেলি পরদায়।

পুরোনো সে তো নতুন যখন, আরও নতুন।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

লেন্সগুলো খেলনার দোকানে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নামে বিক্রি হয়। শুধু হাতল কেটে দেবে, চারধারে রিং যেমন থাকে থাকবে, ফলে কাজ অনেক কমে যাবে।

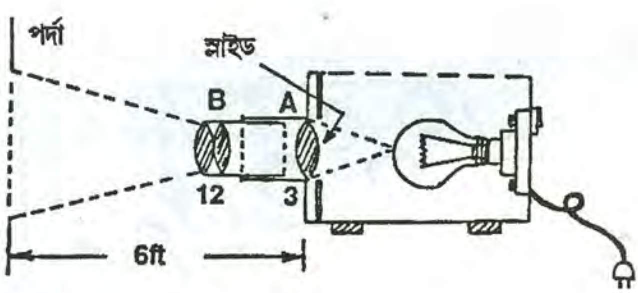

পিচবোর্ডের রিং তৈরির জন্য লাগবে একটা জুতোর বাক্সের পিচবোর্ড। এক ইঞ্চি মতো চওড়া কেটে গোল করে ছবি নং ২-এর মতো চোঙগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এতে লেন্সগুলো বেশ ভালোভাবে এঁটে বসবে।

L ক্ল্যাম্প পাবে Hardware (হার্ডওয়ার) দোকানে। সাইজ ১.২"।

ল্যাম্প হোল্ডার হবে বেস টাইপ (base type), কারণ মাপ সেইমতো দেওয়া আছে।

স্লাইড মুভার কার্ডবোর্ডের বদলে অ্যালুমিনিয়াম হলে টেঁকসই হবে। তখন প্লাইউড আর অ্যালুমিনিয়াম প্লেট দুটো (৪নং ছবি) রিবেট করে দেবে।

দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা বলি।

প্রথমত, প্রোজেক্টর চলাকালীন একটা-একটা Table fan ব্যবহার করো, না হলে স্লাইড গরম হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্লাইডের জন্য বিশেষ ধরনে ফিল্ম বাজারে পাওয়া যায়।

মডেল–১০

ইন্টারকম সেট

সেদিন বুকুনদের বাড়ি ঢুকতে-না-ঢুকতেই অনিমেষ দা প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়লেন আমার ওপর,–এই যে, দেখো তোমার শ্রীমান ভাইপোর কাণ্ড।

বুঝলাম, কিছু একটা নির্ঘাত হয়েছে।

ভয়ে-ভয়ে বললাম,–ব্যাপারটা কী অনিমেষ দা!

–আর ব্যাপার! তোমারই কথামতো বুকুনকে একটা আলাদা ঘর দিয়েছিলাম পড়ার জন্য; যাতে সেখানে কেউ হামলা না করে।

বললাম,–হ্যাঁ, সে তো জানিই।

অনিমেষ দা বলেন,–হ্যাঁ তা তো জানবেই; তবে এটা কি জানো, শ্রীমান ওই ঘরে বসে-বসে পড়ার বইয়ের তলায় এই বইখানা পড়ছিল?

বলেই টেবিল থেকে একখানা বই তুলে আমাকে দেখালেন। সায়েন্স ফিকশনের সংকলন-কী সর্বনাশ! আমিই তো ক-দিন আগে বুকুনকে তার জন্মদিনে প্রেজেন্ট করেছিলাম।

অনিমেষ দা রাগে গরগর করতে-করতে বলে চলেন,–ছোঁড়াকে কতবার বলেছি সকালবেলা একটু চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ইতিহাসটা, ভুগোলটা মুখস্থ করবি; আজকে ভাগ্যিস ওপরে উঠেছিলাম, দেখি নো শব্দ! আস্তে-আস্তে দরজা ঠেলতেই দেখি, শ্রীমান মুখ থুবড়ে এই রাবিশটা পড়ছেন।

অনিমেষ দা বলার ধরনে অতিকষ্টে হাসি চাপতে গিয়েও পারি না। সত্যি ছোকরার এলেম আছে।

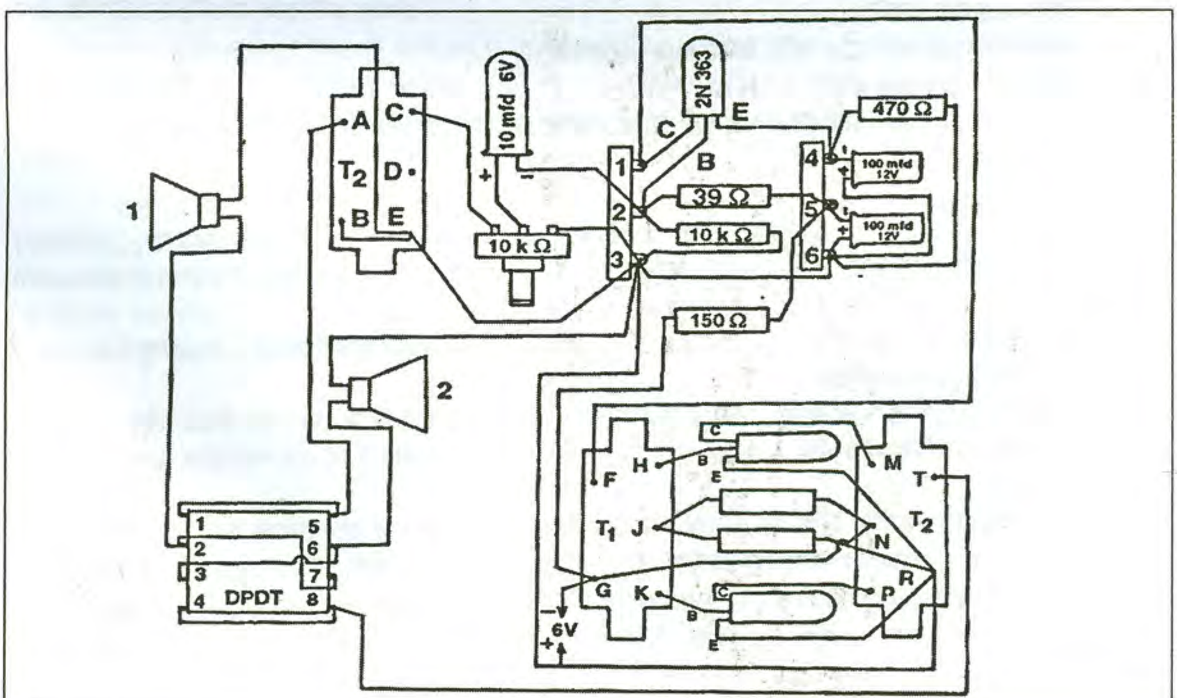

আমার হাসি দেখে বুকুনের পিতা মুহূর্তে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, –হেসো না,–হেসো না, ভাইপোটাকে গোল্লায় পাঠালে একেবারে! এ যন্তর বানাও, ও যন্তর বানাও, সায়েন্স ফিকশন পড়ো, যত্তোসব ছাইভস্ম। কই এমন জিনিস বানাও তো দেখি, যাতে করে আমি দোতলায় আমার ঘরে বসেই বুঝতে পারি বুকনটা ওপরের ঘরে জোরে-জোরে পড়ছে কি না!

বললুম–খুব সোজা অনিমেষ দা! শুধু বুঝতে পারা কেন? প্রয়োজন হলে আপনি ঘরে বসেই বুকুনকে ধমকেও দিতে পারবেন।

বটে! বটে! তাই নাকি! –এবার একটু হাসি ফোটে অনিমেষ দা'র মুখে ঃ কই, বানাও দেখি!

এবার আমি একটু আকাশের দিকে তাকাই; তারপর রান্নাঘরের দিকে। উদাস হয়ে জিগ্যেস করি,–চপ ভাজার গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে?

–আরে বাবা শুধু চপ কেন? তোমাকে সিঙাড়া, কাটলেট, ডিমভাজা সব খাওয়াব, আগে কলটা বানাও দেখি।

–আগে তো খাওয়ান!

কথাবার্তার মাঝেই ভাবির আবির্ভাব। হাতে প্লেটে সেই বহু আকাঙ্খিত মুচমুচে আলুর চপ।

এক কামড় দিয়েই তারিয়ে উঠলাম,–আঃ দারুণ চপ! কিন্তু সেই শ্রীমান কোথায়?

বাব্বা! ওতেও ভাইপোকে দরকার! সত্যি, চেলা একখানা বানাচ্ছ বটে!– বলেই বউদি হাঁক পাড়েন ঃ বুকুন! বুকুন! চলে আয়, বাবা আর বকবে না।

মঞ্চে বুকুনের প্রবেশ! মুখখানা কাঁচুমাচু! একখানা চপ তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললুম,–ভয় নেই রে! বাবা আজ আর বকবে না! ঝটপট চপগুলোকে খতম কর, তারপর নতুন মডেল!

মডেলের কথা শুনে বুকুনের মুখটা হাসিতে চলকে ওঠে। ঝলমলে মুখে বলে ওঠে,–নতুন মডেল!

–হ্যাঁ, এটা তুই-ই বানাবি, তবে তোর জন্যে নয়, তোর বাবার জন্য!

এরপর যথারীতি বুকুনের হাতে লিস্টখানা ধরিয়ে দিই ঃ

১. ট্রান্সফরমার—T2 দুটো ও T_1 একটা।

২. ভল্যুম কন্ট্রোল—10 KΩ একটা।

৩. সুইচ—DPDT একটা।

৪. কন্ডেন্সার—100 mfd 12v দুটো ও 10 mfe 6v একটা।

৫. ট্রানজিস্টর—2N 363 একটা ও 2N 610 দুটো।

৬. রেজিস্টর (resistor)—100 Ω 3.9 K Ω, 10K Ω 39 K Ω, 470 Ω, 150 Ω—প্রতিটি একটা করে।

৭. স্পিকার —5" দুটো।

৮. ট্যাগ—3 way দুটো।

এবার সার্কিট অনুযায়ী কাজ শুরু করার পালা। একটা লম্বা কাঠের টুকরোর ওপর একদিকে একটা T_2 ট্রান্সফরমার, তারপর পর-পর ট্যাগদুটো; তার পরে T_1 এবং অবশেষে T_2 ট্রান্সফরমার। DPDT সুইচ আর ভল্যুম কন্ট্রোলটা কোথায় কীভাবে রাখলে সুবিধে হবে সেটা কিন্তু ভেবে বের করতে হবে।

DPDT সুইচ-এর এপাশে চারটে, ওপাশে চারটে, মোট আটটা কনেকশন পয়েন্ট আছে। সেগুলোকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 নম্বর দিয়ে নিলেই সুবিধে।

এবার 1 আর 5, 2 আর 7, 3 আর 6, 4 আর 8 পয়েন্টগুলো সরাসরি তার দিয়ে যোগ কর দিতে হবে।

ট্রান্সফরমারের পয়েন্টগুলোর নাম A, B, C, D... করে দেওয়া হয়েছে। আর ট্যাগ-এর পয়েন্টের নম্বরও 1, 2, 3, 4 ... করে দেওয়া হল।

T1 ট্রান্সফরমারের B, E আর ট্যাগ-এর 3 নম্বর পয়েন্ট সরাসরি তার দিয়ে যোগ করে দেওয়া হল। ভল্যুম কন্ট্রোল-এর একটা ধারের পয়েন্টও C পয়েন্টের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হল। A পয়েন্ট থেকে একটা তার চলে এল DPDT সুইচের 5 নম্বরে।

10 mfd 6v কন্ডেন্সার-এর পজিটিভ (+) প্রান্ত ভল্যুম কন্ট্রোল-এর মাঝের পয়েন্ট আর নেগেটিভ (-) প্রান্ত ট্যাগ-এর 2 নম্বর পয়েন্ট যোগ হবে। ভল্যুম কন্ট্রোলের ফাঁকা পড়ে থাকা পয়েন্টটা ট্যাগ-এ 3 নম্বর পয়েন্টের সঙ্গে সরাসরি

তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া যাক্।

2N 363 ট্রানজিস্টর-এর কালেক্টর, বেস আর এমিটর যথাক্রমে যোগ হবে ট্যাগ-এর 1,2 এবং 4 নম্বর পয়েন্ট-এ। 10K Ω রেজিস্টরটা 2 এবং 3 নম্বর পয়েন্টে, 39K Ω রেজিস্টরটি 2 এবং 5 নম্বর পয়েন্টে, আর 470 Ω রেজিস্টরটা 4 এবং 6 নম্বর পয়েন্টে জুড়ে দেওয়া হল। এবার কন্ডেন্সারগুলো লাগানোর পালা। 100 mfd 12v দুটো কন্ডেন্সার আছে। দুটোরই পজিটিভ প্রান্তে 6 নম্বর পয়েন্ট যোগ হবে; তার পর একটার নেগেটিভ প্রান্ত চলে আসবে 5 নম্বরে, অন্যটার 4 নম্বরে।

3 আর 6 নম্বর পয়েন্টকে সরাসরি তার দিয়ে যোগ করতে হবে।

এবার 1 নম্বর পয়েন্ট থেকে একটা লম্বা তার লাগিয়ে সে তারটা চলে আসবে T1 ট্রান্সফরমারের F পয়েন্টে, 3 নম্বর পয়েন্ট থেকে লম্বা তার চলে আসবে অন্য T_2 _র R প্রান্তে। 5 নম্বর পয়েন্ট থেকে একটা 150 Ω লাগিয়ে তার অপর প্রান্ত যোগ হবে T_1 ট্রান্সফরমারের G প্রান্তে।

ওই ট্যাগদুটোর কাজ আপাতত শেষ। T_1 ট্রান্সফরমারের G প্রান্ত এবং T_2 ট্রান্সফরমারের N প্রান্ত সরাসরি তার দিয়ে যোগ করতে হবে।

এবার দুটো ট্রানজিস্টর লাগানোর পালা। দুটোই 2N 610। দুটোরই এমিটর চলে যাবে T2-র R পয়েন্টে; একটার কালেক্টর আসবে P পয়েন্টে, অন্যটার M পয়েন্টে। যে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর P পয়েন্টে যোগ হয়েছে, তার বেস K পয়েন্টে গিয়ে লাগবে আর অন্যটার বেস H পয়েন্টে লাগবে। আর দুটো রেজিস্টর লাগানো বাকি, তা হলেই কাজ শেষ হয়। 100 Ω রেজিস্টরটা J আর R-এর মধ্যে এবং 3.9 K Ω রেজিস্টরটা J এবং N-এর মধ্যে লাগাতে হবে।

এই সেটে 6v সাপ্লাই প্রয়োজন। অর্থাৎ চারটে 1.5 ভোল্ট-এর ব্যাটারি চাই। ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত G পয়েন্টে আর পজিটিভ প্রান্ত R পয়েন্টে যোগ হবে।

কাজ শেষ; এবার স্পিকার লাগানোর পালা। যেটা প্রধান স্পিকার বা Master Speaker অর্থাৎ কিনা যেটা অনিমেষ দা'র ঘরে থাকবে, সেটা দুটো পয়েন্টে যোগ করলাম T1 ট্রান্সফরমারের E পয়েন্ট আর DPDT সুইচের 2 নম্বর পয়েন্টে। আর 2 নম্বর স্পিকার যেটা বুকুনের ঘরে থাকবে, সেটার দুটো পয়েন্ট যোগ হল ট্যাগ-এর 3 নম্বর পয়েন্ট এবং DPDT সুইচের 6 নম্বর পয়েন্টের সঙ্গে।

যন্ত্রপাতি সমেত প্রধান স্পিকারটি অনিমেষ দা'র ঘরে শোভিত হল আর ২ নম্বর স্পিকারটার তার লম্বা করে পাঠিয়ে দেওয়া হল শ্রীমান বুকুনের টেবিলের ওপরে।

এবার DPDT সুইচটা 'শোনা'র দিকে করতেই ওপরে পড়ার ঘর থেকে বুকুনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আর DPDT সুইচ 'বলা'র দিকে করতেই বুকুনের ঘরে ভেসে এলো অনিমেষ দা'র গমগমে কণ্ঠস্বর,–কি রে! জোরে জোরে পড়ছিস না কেন? ভল্যুম কন্ট্রোলটা রইল তৌফিক ভাইয়ের ঘরে, ইচ্ছেমতো শব্দ কমানো, বাড়ানোর জন্য।

এটা তৈরি হওয়ার আগে কিন্তু বুকুনকে বলিনি যে ব্যাপারটা কী হতে চলেছে। কিন্তু তৈরি হওয়ার পর যন্ত্রটার কাজকর্ম দেখে বুকুন যখন বুঝল, এটা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তৈরি হয়েছে, তখন থেকে বুকুন আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিল।

এ অবস্থা অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র তিনদিন।

মডেল–১১ আলোর মালা

ইন্টারকম সেট তৈরি হওয়ার পর বুকুনের ভারি অসুবিধে হয়ে গেছে। রোজ সকালবেলা জোরে-জোরে ইতিহাস, ভুগোল মুখস্থ করতে হয়। দোতলায় মাঝে-মাঝেই সুইচ টিপে ১ নম্বর স্পিকারে অনিমেষ দা শুনে নেন বুকুনের কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বর না পেলে হুংকার পাড়েন–কিরে! ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

বুকুনও আমার ওপর এখনও একটু চটে আছে এই মডেলটা তৈরি করার পর থেকে।

ওর ঘরে একটা বিবেকানন্দের মূর্তি আছে।

বুকুনের অনেকদিনের ইচ্ছে ওই মূর্তির পায়ের কাছে লাল নীল সবুজ হলদে নানারকম রঙের একটা আলোর জ্বলা-নেভা মালা লাগাবে।

তাই বুকুনের রাগ ভাঙাতে বললুম,–বেশ! এই লিস্ট মিলিয়ে জিনিসগুলো জোগাড় করে ফেল।

১। রেজিস্টর ঃ 330 K Ω একটা, 10 K Ω একটা, 1 K Ω একটা;

২। কন্ডেন্সর ঃ 100 mfd, 6v একটা;

৩। ট্রানজিস্টর ঃ AC 127, 2SB 77 একটা;

৪। প্রিসেট ঃ 2.2 K Ω একটা;

৫। টুনিবাল্ব ঃ 6 volt-এ জ্বলে এমন একটা;

৬। LED (Light emitting diode) ঃ ৩-৪টে বিভিন্ন রঙের;

৭। দুটো ট্যাগ ঃ 3-way একটা ও 5-way একটা।

জিনিসগুলো জোগাড় হয়ে গেলেই কাজ শুরু করা যেতে পারে।

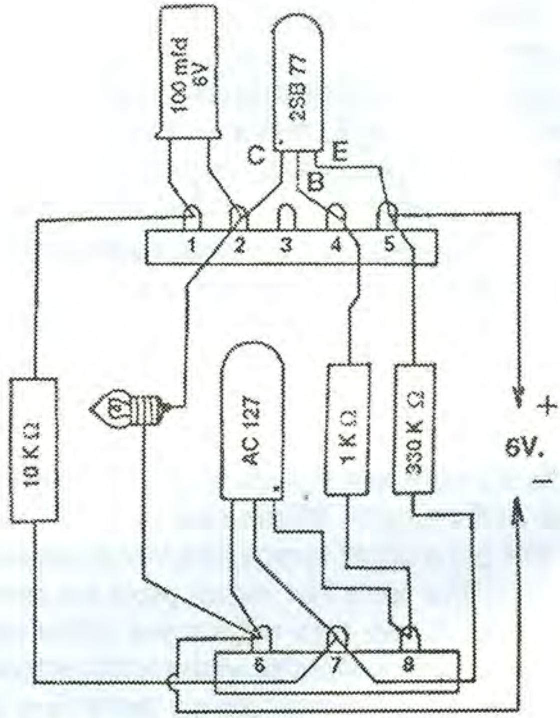

ট্যাগগুলোর কানেকশন পয়েন্টের যদি নম্বর দিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সবচেয়ে ভালো। মনে করা যায়, 5-way যে ট্যাগটা রয়েছে, তার কানেকশন পয়েন্টগুলোর নম্বর 1, 2, 3, 4, 5 আর 3-way ট্যাগটার কানেকশন পয়েন্টগুলোর 6, 7, 8।

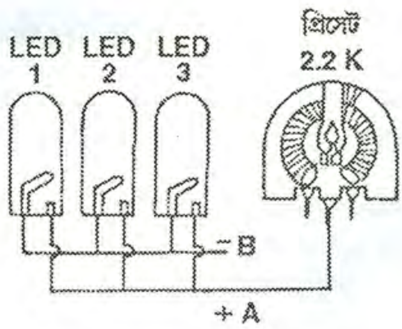

এবার 2, 4 আর 5 নম্বর পয়েন্টে 2N 610 ট্রানজিস্টরের কালেক্টর, বেস এমিটরের ঠ্যাংগুলো যথাক্রমে লাগিয়ে দাও। AC 127 ট্রানজিস্টর বেস ও এমিটারের ঠ্যাংগুলো লাগাও যথাক্রমে 8, 7 আর 6 নম্বর পয়েন্টে।

এবার রেজিস্টর লাগানোর পালা। 1 আর 7-এর

মধ্যে 10 K, 4 আর 8-এর মধ্যে 1 K Ω; 5 আর 7-এর মধ্যে 330K। কন্ডেন্সারটা লাগাবে 1 আর 2 নম্বর পয়েন্টে। পজিটিভ 2 নম্বরে আর নেগেটিভ 1 নম্বরে লাগিও।

6 ভোল্টের ছোট্ট বাল্বটা 6 আর 2-এর মধ্যে লাগাবে। আর এই পুরো সার্কিটটাকে চালাবার জন্য যে 6 ভোল্টের ব্যাটারি, সেটার নেগেটিভটা চলে আসবে 6 নম্বরে, পজিটিভটা 5 নম্বরে।

সার্কিট তৈরি শেষ করেই বুকুন বলে,–আলো তো বেশ জ্বলছে, নিভছে। কিন্তু LED গুলো কী হবে? ওই প্রিসেট যেটা কিনিয়েছ। ওটারই বা কী হবে?

বরাভয় কণ্ঠে বললুম,–বৎস, ধৈর্য ধরো, ক্ষণকাল।

এই সার্কিটে যদি নানা রঙের LED লাগাতে হয়-তা হলে LED গুলো ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবেই জুড়ে নিতে হবে। এবার A প্রান্তটা চলে যাবে প্রিসেটের মাঝের ঠ্যাঙে। B প্রান্তটাকে জুড়ে দিতে হবে 6 নম্বর পয়েন্টে। প্রিসেটের অন্য যে-কোনও একটা প্রান্ত 2 নম্বর পয়েন্টে যোগ হবে। বলা বাহুল্য, ওই টুনিবাল্বটা তখন আর থাকবে না।

কাজ শেষ। এবার ওই LED-র সেটটাকে পছন্দ মতো জায়গায় সাজাবার পালা। খুশিমতো আরও বেশি LED ওখানে জোড়া যেতে পারে, ওই একইভাবে। প্রিসেটটাকে ঘুরিয়ে এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে LED-র আলো খুব বেশি উজ্জ্বল না হয়; কারণ তাতে LED-র আয়ু যায় কমে।

বুকুন ইতিমধ্যে বাজার থেকে ঘুরে এসে সগর্বে জানাল,–তোমার ওই মালটি তৈরি হবে না; কারণ ওই ট্রানজিস্টর পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি বললুম,–তুমি একটি আস্ত হনুমান। ওই ট্রানজিস্টর পাওয়া যাচ্ছে না তো কী হয়েছে? ওর সমধর্মী ট্রানজিস্টর চাইতে পারলি না হাঁদারাম!

বুকুন হাঁ করে মুখের দিকে তাকায়। তাতে আরও বিরক্তি লাগে আমার, –ওরে গবেট, আগের বারেও যা করেছিলুম এখানেও তাই করতে হবে। 2SB 77-এর সমধর্মী হিসেবে বাজারে পাবি 2N 610 আর AC 127-এর বদলে পাবি AC 167 ট্রানজিস্টর। সুতরাং যা আবার বাজারে!

মডেল–১২

রেডিও

সেই রেডিও! যেটা অত ঝামেলা করে আদায় করা হয়েছিল, সেটা মাঝে-মাঝেই হাতছাড়া হয়ে যায় বুকুনের। ও যখন চায় খেলার রিলে শুনতে তখন ওর মা চান গান শুনতে।

শেষপর্যন্ত একদিন তিতিবিরক্ত হয়ে এই মুশকিল-আসান কাকুর দ্বারস্থ হয় বুকুন। হ্যাঁ, ওই নামেই মাঝে-মাঝে বুকুন আমাকে ডাকে। বলে,–আমায় একটা রেডিও বানিয়ে দাও।

বললুম,–রেডিও! সে তো ভয়ানক জটিল ব্যাপার! আরও বড় হ, তারপর বানাবি।

না-না, ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আগেই আমার রেডিও চাই। –বুকুনের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে।

আমি ওকে তবু দমাবার চেষ্টা করি,–অনেক খরচার ব্যাপার কিন্তু!

–কত খরচা? তুমি একটা ছোট সেট বানিয়ে দাও। আমি কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনব। সেদিন তো তুমি বলছিলে যে একটা ট্রানজিস্টর লাগিয়েও রেডিও বানানো যায়!

দেখেছ ছোঁড়ার স্মৃতিশক্তি! এসব ব্যাপারে কোনও ভুল হয় না। সেই কবে একদিন রেডিওর কথা আলোচনা করতে-করতে বলেছিলুম যে, আজকের যে 7/8 কী আরও বেশি ট্রানজিস্টর লাগানো রেডিও আমরা ব্যবহার করছি তার শুরু কিন্তু একটা দুটো ট্রানজিস্টর দিয়েই হয়েছিল। তাতে প্রধান অসুবিধে ছিল ভালো আর্থ করা, আর উঁচু এরিয়াল টাঙানো। আওয়াজও খুব জোরদার হতো না। ট্রানজিস্টর আওয়াজকে বাড়িয়ে দেয়। তাই যত ট্রানজিস্টর বাড়ানো হয়েছে রেডিও-ও তত শক্তিশালী হয়েছে। সব কথা হুবহু মনে রেখেছে দেখছি।

বললাম,–ঠিক আছে, তোর রেডিও তৈরি করা যাবে! তবে আমরা কিন্তু একেবারে প্রথম থেকে শুরু করব। একটা

ট্রানজিস্টর দিয়ে প্রথমে চেষ্টা করব, তারপর দুটো, তারপর তিনটে...এইভাবে। কেমন?

তা হলে লিস্ট করে দাও কী-কী লাগবে। –বুঝলাম বুকুন নাছোড়বান্দা।

আমাকে লিখতেই হল ঃ

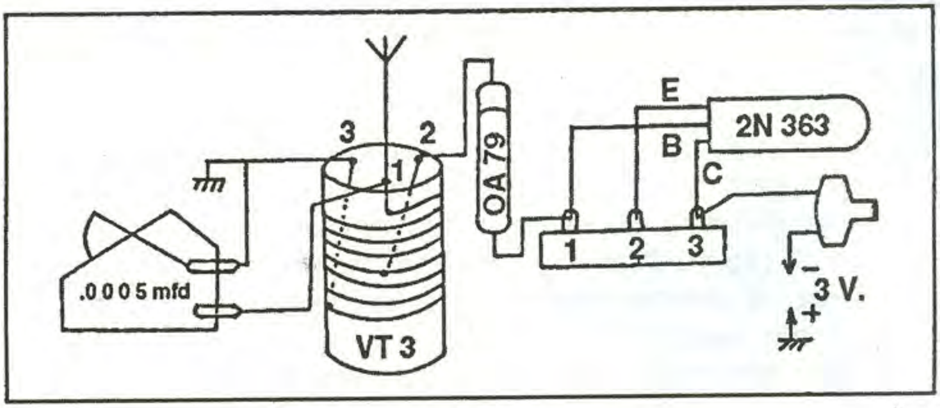

১। ট্রানজিস্টর ঃ 2N 363 একটা ও 2N 610 দুটো;

২। ডায়োড ঃ OA79 (বা IN 60) একটা;

৩। রেজিস্টর ঃ 120 Ω একটা 3.3K Ω একটা 3K Ω একটা ও 100 Ω একটা;

৪। কন্ডেন্সার ঃ 100 mfd 6V একটা;

৬। ভ্যারিয়েবল কন্ডেন্সর ঃ .0005 mfd একটা;

৭। ট্রান্সফরমার ঃ T_1 ও T_2 (একটা করে);

৮। কয়েল ঃ VT 3 একটা;

৯। স্পিকার ঃ একটা;

১০। এরিয়াল ঃ ইনডোর কিনলেই সুবিধে;

১১। ট্যাগ ঃ 3 way একটা;

১২। ব্যাটারি ও ব্যাটারি বাক্স ঃ 6 volt;

১৩। ছোট চেসিস ঃ একটা।

১৪। ইয়ারফোন ঃ একটা।

বুকুনকে বললুম,—অনেক সময় VT 3 কয়েল বাজারে পাওয়া যায় না। যদি না পাস তা হলে ৩৪ নম্বর অ্যানামেলের তার 11/12 গজ কিনে নিবি। বাজারে খোঁজ করিস VT 3 কয়েলের ফর্মাটা পাওয়া যাবে কি না; তাও যদি না পাওয়া যায় তো কুছ পরোয়া নেই, তৈরি করে নেওয়া যাবে।

যদি VT 3 কয়েল না পাওয়া যায় তা হলে বানিয়ে নেওয়া কায়দাটা বলে দিই। মোটামুটি শক্ত একটা কাগজকে পাকিয়ে 1 ইঞ্চি ব্যাসের একটা চোঙ বানাতে হবে। চোঙটা খুব বেশি লম্বা করার প্রয়োজন নেই; 2 ভাগের 1.2 থেকে 3 ইঞ্চি হলেই যথেষ্ট। এই হল কয়েল তৈরির ফর্মা।

এই ফর্মার একটা প্রান্তে পরপর কিছুটা ফাঁক দিয়ে-দিয়ে তিনটে ফুটো করে একটু মোটা তার ঢুকিয়ে পাকিয়ে দাও। এ তিনটেই হল কানেকশন পয়েন্ট। এদের নম্বর দিয়ে দেওয়াই সুবিধে—1, 2 আর 3।

প্রথমে অ্যানামেল তারের একটুখানি অংশ ছুরি বা ব্লেড দিয়ে চেঁচে নিয়ে 1 নম্বর পয়েন্টের সঙ্গে ঝালাই করে দিতে হবে। এবার তারটাকে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী পেঁচানোর পালা। চল্লিশটা পাক দিয়ে তারটাকে না কেটে ওপরে তুলে এনে 1 নম্বর পয়েন্টে লাগিয়ে ঝালাই করে দিতে হবে। ঝালাই করার আগে কিন্তু এখানেও তারটাকে একটু চেঁচে নিতে হবে।

এবার তারটাকে নামিয়ে এনে আবার পরপর পঁচাত্তরটা পাক দিয়ে শেষ প্রান্তটা টেনে তিন নম্বর পয়েন্টে লাগিয়ে দিলেই কাজ শেষ। এবার তারের পাকের ওপর কিছুটা গলানো মোম ঢেলে দিলে পাকগুলো খুলে যাওয়ার ভয় থাকে না।

বাজারে যে কয়েল কিনতে পাওয়া যায় তাতে সাধারণত 1 নম্বর পয়েন্টের রং থাকে কালো, 2 নম্বর পয়েন্টের রং থাকে সবুজ এবং 3 নম্বর পয়েন্টের রং থাকে হলুদ। কয়েলটাকে একটু ভালো করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেও ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে।

কাজ শুরু হয়ে গেল পরের দিন থেকেই। বুকুনকে বললাম,–আগে একটা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করেই রেডিওটা বানানো যাক। বুকুন ইতিবাচক ঘাড় নাড়ে।

প্রথমেই চেসিসের ওপর ট্যাগটাকে ঝালাই করে লাগিয়ে নেওয়া হল। 2N 363 ট্রানজিস্টরের বেস, এমিটর আর কালেক্টর পর-পর লাগিয়ে দিলাম ট্যাগের 1 নম্বর, 2 নম্বর আর 3 নম্বর পয়েন্টে।

এবার কয়েলের দু নম্বর প্রান্তে 0A79 ডায়োডটা লাগিয়ে অন্য প্রান্তটা ট্যাগের 1 নম্বর পয়েন্টে লাগিয়ে দেওয়া হল। কয়েলের 3 নম্বর প্রান্ত থেকে একটা তার এনে চেসিসের গায়ে ঝালাই করে দেওয়া হল।

.0005 mfd ভ্যারিয়েবল কন্ডেন্সারকে একটু ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে যে তার একটা অংশ ঘুরতে পারে আর-একটা অংশ স্থির থাকে। স্থির অংশ থেকে যে কানেকশন, পয়েন্টটা বের করা আছে সেটা যোগ করা হল কয়েলের 1 নম্বর পয়েন্টে। আর ঘুরতে পারে যে অংশটা, তার থেকে যে কানেকশন বের করা আছে সেটার সঙ্গে একটা তার লাগিয়ে তারটার অপর প্রান্ত চেসিসে লাগিয়ে দেওয়া হল।

ইয়ারফোনের একটা প্রান্ত চলে এল ৩ নম্বর পয়েন্টে; অপরটা 3V ব্যাটারির নেগেটিভে। ব্যাটারির পজিটিভের সঙ্গে একটা তার লাগিয়ে সেটার অপর প্রান্ত চেসিসে ঝালাই করা হল।

তা হলেই কাজ শেষ।

তবে এরিয়ালটা ছাদে টাঙাতে হবে–উঁচু করে। সেই এরিয়াল থেকে একটা তার টেনে এনে কয়েলের 1 নম্বর প্রান্তে জুড়ে দিতে হবে। আর-একটা কাজ কিন্তু বাকি; সেটা হল আর্থ করা। চেসিসের গা থেকে একটা তার টেনে এনে আর্থ করতে হবে।

ইয়ারফোনের একটা প্রান্ত চলে এল 3 নম্বর পয়েন্টে; অপরটা 3V ব্যাটারির নেগেটিভে। ব্যাটারির পজিটিভের সঙ্গে একটা তার লাগিয়ে সেটার অপর প্রান্ত চেসিসে ঝালাই করা হল।

তা হলেই কাজ শেষ।

বুকুনকে দেখি ও ওই তারটা নিয়ে জড়িয়ে দিয়েছে কলের পাইপের গায়ে। বললাম,-এর চেয়েও ভালো আর্থের ব্যবস্থা আর-একটা করা যায়। খেয়াল করে দেখ তোদের বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনের সঙ্গে-সঙ্গে একটা আবরণহীন তারও লাগানো রয়েছে। সেটাই হল সবচেয়ে ভালো আর্থ কানেকশন করার জায়গা। ওই তারটাকে একটু ঘষে নিয়ে সেখানে এটাকে লাগিয়ে দে। দেখিস বাপু, আবরণ দেওয়া তারগুলোকে কাটিসনে যেন।

যাদের বাড়িতে বজ্ররক্ষী আছে, সেখান থেকে একটা লোহার পাত নিশ্চয়ই নিচে পর্যন্ত গেছে। সেটার সঙ্গে জড়িয়েও ভালো আর্থ করা যেতে পারে।

এবার ইয়ারফোন কানে গুঁজে, ভ্যারিয়েবল কন্ডেন্সার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নানান কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার পালা।